৩৫ বর্ষ ■ ২য় সংখ্যা ■ এপ্রিল-জুন ২০১৫

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
মূল্যবোধের কবিতা	বন্দে আলি মিঞা	১
আমাদের কথা		২
রবীন্দ্রনাথ ও দার্শনিক ঐতিহ্য	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৩
অসংগঠিত মানুষের লড়াই	বোলান গঙ্গোপাধ্যায়	৯
একটি শিশুর মৃত্যু	ভবানীপ্রসাদ সাহু	১১
অঙ্কের বাস্তবতা	ভূপতি চক্রবর্তী	১৩
করোনারি অ্যানজিওগ্রাম	গৌতম মিস্ত্রি	১৮
পূর্ব কলকাতার জলাভূমি	ধ্রুবা দাশগুপ্ত	২৩
ওরা ভয় পেয়েছে		২৬
বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে		২৭
শিশু সম্পদ, না সমস্যা	অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮
আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ		৩০
বিপন্ন কুলিয়া বিল		৩১
রূপালী আলোর রেখা	অরুণ পাল	৩২

সম্পাদক
সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস: বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪
কার্যালয়: খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন
বি ৪ ও ৫, এস- ৩, নারায়ণপুর
পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০ ১৩৬
ফোন: ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/
৯৮৩১৪৬১৪৬৫
ওয়েবসাইট: www.utsamanush.com
ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com

মূল্যবোধের কবিতা

আমাদের ছোট গাঁয়ে

বন্দে আলি মিঞা

আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর,
থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর।
পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই,
এক সাথে খেলি আর পাঠশালে যাই।
হিংসা আর মারামারি কভু নাহি করি,
পিতা মাতা গুরুজনে সদা মোরা ডরি।

আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান,
আলো আর বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ।
মাঠভরা ধান আর জলভরা দীঘি,
চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি।

আমগাছ জামগাছ বাঁশঝাড় যেন,
মিলেমিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন।
সকালে সোনার রবি পূব দিকে ওঠে,
পাখি ডাকে, বায়ু বয় নানা ফুল ফোটে।

আধুনিক জীবন থেকে 'মূল্যবোধ' শব্দটা প্রায় হারাতে বসেছে। মূল্যবোধ নিয়ে কবিতা-ছড়াগুলোও। পত্রিকার পাতায় প্রায় এক দশক আগে 'মূল্যবোধের কবিতা' শিরোনামে বেশ কিছু কবিতা ছাপা হয়েছিল। সেগুলো এবং আরও কিছু মিলিয়ে আমরা গত বইমেলায় প্রকাশ করেছি বই– 'মূল্যবোধ'। সেই বই থেকেই কিছু কিছু কবিতা-ছড়া দেওয়া হচ্ছে পত্রিকার পাতায়।

সম্পাদক

অদ্ভুত আঁধার

অভিজিৎ রায়কে ঢাকার রাস্তায় সবার চোখের সামনেই গুলি করে খুন করা হল। ওঁর অপরাধ যুক্তিবাদী দর্শনের কথা বলা, মানবাধিকার নিয়ে সরব হওয়া। অভিজিৎ থাকতেন মার্কিন মুলুকে। 'মুক্তমনা ডট কম' নামে ব্লগ লিখতেন। অভিজিতের এই 'বাড়াবাড়ি' সহ্য হচ্ছিল মৌলবাদীদের। ফেসবুকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। ওঁরা গা করেন নি। তথ্যপ্রযুক্তি ইঞ্জিনিয়ার অভিজিৎ স্ত্রী রফিদা আহমেদ বন্যাকে নিয়ে ঢাকার বইমেলা উপলক্ষে দেশে এসেছিলেন। মেলা থেকে বেরিয়ে সামনের চায়ের দোকানে দাঁড়াতেই কয়েকজন ঘিরে চপার দিয়ে কোপাতে থাকে। বাধা দিতে গিয়ে আহত বন্যাও। জায়গাটা জনাকীর্ণ ছিল। তবুও আততায়ীদের পালিয়ে যেতে অসুবিধে হয়নি। অভিজিৎ মারা যান। তাঁর পূর্ব-ইচ্ছা মতো দেহটি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়, যাতে চিকিৎসা-পড়ুয়াদের শিক্ষা ও গবেষণায় কাজে লাগে। চোখ দুটিও দান করা হয়েছে।

অভিজিৎদের খুন করার কাজটা বহুদিন ধরেই শুরু হয়েছে। ইদানীং একটু বেশি গতি পেয়েছে এই যা। ২০০৪-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক তথা 'পাক সার জামিন'-এর লেখক-কবি হুমায়ুন আজাদকে একুশের বইমেলা থেকে ফেরার পথে চপার দিয়ে কোপানো হয়েছিল। ২০১৩-র ফেব্রুয়ারিতে ইসলামবিরোধী নাস্তিক তকমা দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছিল শাহবাগ আন্দোলনের কর্মী ব্লগার রাজীব আহমেদ হায়দারকে। আমরা যে এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা নামাবলী গায়ে জড়িয়ে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-র ফানুস উড়িয়ে খুব ভাল আছি এমন নয়। নরেন্দ্র দাভোলকারকে খুন করা হয়েছিল। বাংলাদেশে অভিজিৎকে খুনের দিনকয়েক আগেই গুলি করা হয়েছিল দাভোলকারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী প্রবীণ সি পি আই নেতা গোবিন্দ পানসারে ও তাঁর স্ত্রী উমাকে। গোবিন্দ পানেসরের বয়স হয়েছিল ৮২, স্ত্রীর ৭২। তবুও আততায়ীদের হাত কাঁপে নি। কোলাপুরে প্রবীণ দম্পতি প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, তখনই গুলি করা হয়। যুক্তিবাদী আন্দোলন ছাড়াও পানেসর ভূমিহীন কৃষকদের, স্বার্থরক্ষা, পরিচারিকা ও বস্তিবাসীদের অধিকার এবং জাতপাতের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করতেন। তার জন্য গত পাঁচ দশক তাঁকে বহুবার শারীরিক নিগ্রহের শিকার হতে হয়েছে। এবার চরম শিক্ষা দেওয়ার উদ্‌যোগ নেওয়া হয়েছিল। অভিজিৎকে খুন ও মেটিয়াবুরুজের মাদ্রাসার প্রধানশিক্ষক কাজী মাসুম আখতারের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদ করে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সাইটে 'আমি নাস্তিক হয়ে গেলাম' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন ডায়মন্ড হারবারের স্কুলশিক্ষিকা শর্মিলা ঘোষ। আর এই অপরাধে শুধু তাঁকেই নয়, তাঁর শিক্ষক স্বামী রফিউদ্দিন আহমেদ ও ছয় বছরের কন্যাকে একাধিকবার খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। 'গাজি মো তানজিল' নামের অ্যাকাউন্ট থেকে ধারালো অস্ত্রের ছবি দিয়ে পাশে লেখা হয়েছে– 'এটা তোমার জন্য আসিতেছে অপেক্ষা করো... সাবধান হয়ে যা, ইসলামকে গালাগালি বন্ধ কর। আর, ওয়েটিং-এ থাক।' সর্বশেষ ঘটনাটি পাকিস্তানের। ২৪ এপ্রিল বাড়ির সামনেই গুলি করে খুন করা হল মানবাধিকার কর্মী সাবিন মেহমুদকে।

■ মুক্তচিন্তার মানুষজনের ওপর সরাসরি আঘাত হানার পাশাপাশি আফগানিস্তানের পর বাগদাদে দু হাজার বছরের প্রাচীন অ্যাসিরীয় শহর নিমরুদে বুলডজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল প্রাচীন স্থাপত্য, পুরাকীর্তি। প্রতিদিন বিধর্মীদের মুণ্ডচ্ছেদ করা এবং তার ভিডিও প্রকাশ তো আইসিস জঙ্গিদের নিত্যকর্মপদ্ধতির অন্তর্গত।

■ নেপালের সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের সময় সেখানে ছিলেন বাবা রামদেব। না, তিনি অলৌকিক বা যোগবলে কোনো পূর্বভাস পাননি, এমনকি ঠেকাতেও পারেননি। তবে নিজে খুব জোর প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। একেবারেই মানবিক গুণ দেখিয়ে 'সবই ঈশ্বরের মায়া' না বলে ভক্তদের উদ্ধারকাজে লেগে পড়তে বলেছেন। শুধু তাই নয় সেখানকার ৫০০ অনাথ শিশুকে দত্তক নিয়েছেন। জানিয়েছেন, নেপালের পতঞ্জলী যোগপীঠ ট্রাস্টে তাদের থাকা, খাওয়া এবং পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই মানবিকতা দেখানোর জন্য যোগগুরুর ধন্যবাদ প্রাপ্য।

■ তীব্বতের ধর্মগুরু দলাই লামা সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পুনর্জন্ম প্রথা বন্ধ হওয়া উচিত। টিবেট অটোনমাস রিজিওনাল, যা পিপল্‌স কংগ্রেস নামে পরিচিত তার কর্তা পদ্ম চোলিং দলাই লামার কথাকে ধর্মবিরোধী আখ্যা দিয়ে বলেছেন, এটা ধর্ম এবং তীব্বতের ইতিহাসের বিরোধী।

■ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মানেকা গান্ধী সম্প্রতি উদ্বেগসহ একটি তথ্য পেশ করেছেন, হরিয়ানার ৭০টি গ্রামে বেশ কয়েক বছর ধরে কোনো কন্যাসন্তানের জন্মই হচ্ছে না। সম্ভবত কন্যাভ্রূণহত্যার হিড়িক পড়েছে সেখানে। হে মোর দুর্ভাগা দেশ...।

আ·হ·র·ণ

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতের দার্শনিক ঐতিহ্য

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আগের সংখ্যার পর

বাংলার ঐতিহাসিক ও রবীন্দ্রভাষ্যকার হিসেবে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের খ্যাতি সুবিদিত। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনার পূর্ণাঙ্গ রূপটি যথাযথভাবে বুঝতে গেলে তাঁর জীবনের অন্তিম পর্বটুকু যে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে হবে, অধ্যাপক রায় সে ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নীহাররঞ্জন বলেছেন, একথা ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথ কখনই ''জনজীবনের অন্তর্নিহিত বাস্তবতা থেকে খুব বেশি দূরে সরে যান নি।'' এমনকি তাঁর প্রথম দিককার কবিতা, ছোটগল্প, রূপক-নাটক ও নাগরিক জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস সম্পর্কেও একথা সত্য। ''কিন্তু'', নীহাররঞ্জন জোর দিয়ে বলেছেন, ''তাঁর পরিণত বয়সে— সত্তর পেরোনোর পরে— তাঁর এই বাস্তব বোধের সঙ্গে যুক্ত হলো একটি ইতিহাস-চেতনার পটভূমি। ...কিন্তু মননের পূর্ণমুক্তির জন্য জীবনের অন্তিম বছরগুলি পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়: অপেক্ষা করতে হয় সেই যথার্থ নৈর্ব্যক্তিকতা অর্জনের জন্য, যা, ক্রমান্বয় প্রগতির পথে পৃথিবী ও মানুষের যাত্রার জটিল প্রক্রিয়াটি বোঝার মতো স্বচ্ছ দৃষ্টি দেয়। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর জীবনের শেষ দশ বছরে শুরু হয় তাঁর সৃষ্টিকর্মের এক নতুন পর্যায়। এটি কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী পর্যায়গুলি থেকে অন্তরের দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন নয়। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর জীবনের এই শেষ পর্যায়টি শেষবারের মতো সৃষ্টির ফুলে ফুলে ভরে উঠে মহিমান্বিত করল তাঁর পূর্ব-পর্যায়গুলি। ইতিহাসের দিক থেকে একে ব্যাখ্যা করা চলে একটি যৌক্তিক প্রক্রিয়ার পূর্ণতা অর্জন বলে।

জীবনের এই শেষ দশ বছরে কবির বিকাশের প্রক্রিয়াটি নিঃসন্দেহে খুবই জটিল। স্বদেশের এবং বিদেশের নানা ঘটনার বেশ ভালোরকম অভিঘাত পড়ে তাঁর ওপর। রূঢ়ভাবে নাড়া খায় তাঁর আগেকার বহু স্বপ্ন, শান্ত-সমাহিত ভাব আর ধ্যানগম্ভীর মিস্টিক উচ্ছ্বাস। ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় আইন-অমান্য আন্দোলন ভেঙে যায়; তার পরেই শুরু হয় চণ্ড সাম্রাজ্যবাদী দমন, সারা ভারত জুড়ে খর্ব করা হয় সমস্ত নাগরিক অধিকার। কিন্তু আন্তর্জাতিকতায় অঙ্গীকারবদ্ধ কবিকে সম্ভবত আরও বেশি আতঙ্কিত করেছিল বহির্বিশ্বের ঘটনাবলী। নীহাররঞ্জন সংক্ষেপে বলেছেন, ''১৯৩১ সালে, বিদেশে, লুব্ধ জাপান ঝাঁপিয়ে পড়ল ঐতিহাসিক কিন্তু সংগ্রামী চীনের ওপর; ১৯৩৫-এ শুরু হলো কালো দুর্বল আবিসিনিয়ার ওপর ফ্যাসিবাদী ইটালির নরঘাতী আক্রমণ আর ১৯৩৬-এ জার্মান ও ইটালীয় ফ্যাসিবাদ আক্রমণ করল সাধারণতন্ত্রী স্পেন। সারা ইওরোপ আর পশ্চিমী দুনিয়া জুড়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নৈতিকতার মান হু হু করে নেমে এসে পৌঁছল এক অবিশ্বাস্য নীচতায়, আর এর ফলে মুক্ত হলো যে শক্তি তা রুদ্ধ করতে চাইল মানবতার কণ্ঠস্বর। সর্বত্রই কবির প্রিয়তম মানুষ হলো শৃঙ্খলিত; যে মানবতার একমাত্র বেদীমূলে নিবেদিত কবির যাবতীয় পূজা, সবখানেই অপবিত্র হলো তা; আর শেষপর্যন্ত, ১৯৩৯ সালে মানুষের ভাগ্য তথা মানবতার ভবিষ্যৎ নিক্ষিপ্ত হলো মৃত্যু আর ধ্বংসের ঘূর্ণিতে।''

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ *The Waste Land*-এর মতো কিছু লিখলেন না। এমনকি তাঁর সেই আগেকার ধর্মবিশ্বাস আর অধিবিদ্যার প্রতি অঙ্গীকারকে প্রগাঢ়তর ক'রে তার মধ্যেই আশ্রয় খোঁজার চেষ্টাও করলেন না। তাঁর চিন্তা এবং ধ্যানধারণা একটা মোড় নিল— ওপর-ওপর দেখলে যেটাকে খুব অদ্ভুত মনে

হবে। কবির জীবনের শেষ দশ বছরের লেখার ভিত্তিতে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, ''জীবনের শেষ দশ বছরে কবি তাঁর সত্তার গভীরতম ক্ষেত্রে ক্রমেই হয়ে উঠছিলেন আরও বেশি করে ধর্মনিরপেক্ষ। মৃত্যুর যতই সমীপবর্তী হচ্ছিলেন তিনি, ততই আরও বেশি করে হয়ে উঠছিলেন পার্থিব, আরও বেশি করে ভালোবাসছিলেন মানুষকে, আরও বেশি করে পান করছিলেন জীবন-নির্ঝরের জল। কবি তাঁর প্রভুর কাছে অকারণে এ প্রশ্ন তোলেন নি যে, দীনাতিদীনের ওপর অত্যাচারের জন্য যারা দায়ী তাদের তিনি ভালোবেসেছেন কি না। আর মনুষ্যত্বের অবমাননাকারী বর্তমান সমাজব্যবস্থার অস্তিত্ব কতখানি ন্যায়সঙ্গত। রবীন্দ্রনাথের জীবনের সৃজনী প্রতিভার শেষ পর্যায়ের পটভূমিতে ছিল পুরোপুরি এই মানসিক প্রবণতা।''

এইমাত্র যা বলা হল, কবির মানসিক প্রবণতার এই বাঁক বেশ আশ্চর্যই মনে হয়। মানুষ সাধারণত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি রক্ষণশীল, বেশি ধর্মপরায়ণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে আরও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কেননা মানুষ তখন মৃত্যুর পদধ্বনি শোনে আর ভয় পেয়ে যায়। তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ের কবিতা— বিশেষত, 'রোগশয্যায়' (১৯৪০), 'আরোগ্য' (১৯৪১) এবং 'জন্মদিনে' (১৯৪১) কাব্যগ্রন্থে সংকলিত কবিতা থেকে সহজেই বোঝা যায় কবি কীভাবে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁর আসন্ন সমাপ্তি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অসাধারণ ব্যাপার হল এই যে, আসন্ন মৃত্যুর বোধ তাঁর চেতনাকে পঙ্গু করে দেয়নি। তিনি ভয় পাননি কারণ ইতিমধ্যেই মৃত্যুকে তুচ্ছ করার একটি দর্শন তিনি গড়ে তুলেছেন। এই দর্শনই হল তাঁর মানবতাবাদ, যার সঙ্গে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। নীহাররঞ্জন রায় খুবই সঙ্গতভাবেই বলেছেন, ''তিনি স্বীকৃতি দিলেন শুধু মানুষের দাবিকে, গতানুগতিকতার সংস্কারমুক্ত মানবতার দাবিকে, সমস্তরকম সামাজিক-অর্থনৈতিক দাসত্বের বন্ধনমুক্ত মানুষ হয়ে উঠল তাঁর আদর্শ। এই দাবির জন্যেই, এই আদর্শের জন্যেই কবি সাজালেন তাঁর জীবনের শেষ দশ বছরের নৈবেদ্য, অবশেষে যার তুঙ্গে এল কবিকণ্ঠের বজ্রনির্ঘোষ, শাশ্বত মানুষের শত্রুদের প্রতি যা হানল কঠিন ভ্রূকুটি। সেই প্রহরী আর নেই, কিন্তু তাঁর সেই কঠোর সতর্কবাণী আজও রয়ে গেছে 'সভ্যতার সংকট'-এ।

উপরের উদ্ধৃতিতে কবির জীবনের অন্তিম প্রবণতাটি খুব ভালভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য, এর সঙ্গে সম্ভবত কয়েকটি বিষয়ের একটু ব্যাখ্যা যোগ করা দরকার।

যে শাশ্বত মানুষের কথা এইমাত্র বলা হল সেটি তাঁর পূর্বতন বোধের মত প্রায়-আধিবিদ্যক ধরনের কিছু নয়। এই ধরনটি ইতিমধ্যেই কবির চেতনার পশ্চাৎপটে চলে গেছে আর তার জায়গায় এসেছে রক্তমাংসের লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ। তার মানে অবশ্য এই নয় যে রবীন্দ্রনাথের আগের লেখায় এই রক্তমাংসের মানুষ ছিল না। তাঁর অপূর্ব সব ছোটগল্পে আর ঐ রকমই সুন্দর গান ও কবিতায় তারা ছড়িয়ে আছে। সম্ভবত, অন্য যে কারও চেয়ে প্রবলভাবে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তাদের দুর্ভাগ্যের যন্ত্রণা। কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি খানিকটা অসহায়ও বোধ করেছিলেন। তাদের দুর্ভাগ্যের খানিকটা উপশম হয় এমন কিছু পরামর্শমাত্র তিনি দিতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাদের অবস্থার সম্পূর্ণ এবং মৌলিক পরিবর্তন হতে পারে এমন ধরনের কিছুই তিনি বলতে পারেননি।

এরপর তাঁর ১৯৩০-এর অভিজ্ঞতা। তাঁর মনে হয়েছিল এ অভিজ্ঞতা যেন বিস্ময়ের চেয়েও বিস্ময়কর। ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে নেওয়া একটি উপমার সাহায্যে তিনি একে বর্ণনা করলেন, পৃথিবীর ''সব চেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান'' বলে। তিনি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বললেন, ''না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।'' অবশ্য তীর্থযাত্রীরা যার পেছনে ছোটে তিনি সেরকম কিছুর কথা এখানে বলছেন না: তিনি যা বলছেন তা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। কবির নিজের ভাষায়, ''আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে গিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্‌ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল আজ তারা সমাজের অন্ধকুটুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার কাছে সমান আসন পাবার অধিকারী।''

রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্তিম পর্বে, বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে জীবনের শেষ দশবছরে তাঁর মানবতাবাদে যে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছিল, আমরা এতক্ষণ সেটাই বোঝার চেষ্টা করছিলাম। এটি শুরু হয় ১৯৩০-এ তাঁর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের অভিজ্ঞতার পর থেকে। এই অভিজ্ঞতা কীভাবে তাঁর মৌল বিশ্বাসের গুণগত পরিবর্তন আনতে শুরু করেছিল, কবি নিজেই তা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন:

''চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে, কম প'রে, কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে;

সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা রোগে মরে, উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে— জীবনযাত্রার জন্য যত-কিছু সুযোগ যুবিধে সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে— উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

আমি অনেকদিন এদের কথা ভেবেছি, মনে হয়েছে এর কোনো উপায় নেই। একদল তলায় না থাকলে আর-একদল উপরে থাকতেই পারে না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে। উপরে না থাকলে নিতান্ত কাছের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না, কেবলমাত্র জীবিকানির্বাহ করার জন্যে তো মনুষ্যত্ব নয়। একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে এসেছে। মানুষের সভ্যতায় এক অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে। তাই ভাবতুম যেসব মানুষ শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীরমনের গতিকে নীচের তলায় কাজ করতে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষাস্বাস্থ্য-সুখসুবিধার জন্যে চেষ্টা করা উচিত।...

[...] যাই হোক, আমি ভালো করে কিছুই ভেবে পাই নি, অথচ অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে, তবেই সভ্যতা সমুচ্চে থাকবে এ কথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্কার আসে।

[...] রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা চলছে, তার শেষ ফলের কথা এখনও বিচার করবার সময় হয়নি, কিন্তু আপাতত যা চোখে পড়ছে তা দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। আমাদের সমস্যার সব চেয়ে বড়ো রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা। ... এখানে সেই শিক্ষা যে কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। ... কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা হয়ে না থাকে এজন্যে কী প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উদ্যম। শুধু শ্বেত-রাশিয়ার জন্যে নয়— মধ্য-এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেগে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে, সায়েন্সের শেষ-ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায় এজন্য প্রয়াসের অন্ত নেই। এখানে থিয়েটারে ভালো ভালো অপেরা ও বড়ো বড়ো নাটকের অভিনয়ে বিষম ভীড়, কিন্তু যারা দেখছে তারা কৃষি ও কর্মীদের দলের। কোথাও এদের অপমান নেই। ইতিমধ্যে এদের যে দুই-একটা প্রতিষ্ঠান দেখলুম সর্বত্রই লক্ষ্য করেছি এদের চিত্তের জাগরণ এবং আত্মমর্যাদার আনন্দ। [...] কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এদের জনসাধারণের অবস্থার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল— এই অল্প কালের মধ্যে দ্রুত বেগে বদলে গেছে— আমরা পড়ে আছি জড়তার পাঁকের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন।"

কবির নিজের কথায় দাঁড়াচ্ছে এই যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে তিনি যা ঘটতে দেখলেন তা এক ধাক্কায় সমাধান করে দিল তাঁর একটি মৌলিক সমস্যা— মানবতার প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার সূত্রে তিনি আগেই যেটির মুখোমুখি হয়েছিলেন। এর ফলে জীবনের অন্তিম পর্বে কবির চিন্তাভাবনা ও মানসিক প্রবণতা একটি মোড় ফিরল। তা বলে অবশ্য তিনি মার্কসবাদী বা কমিউনিস্ট হয়ে গেলেন না।

তাহলে, কবির নিজের কথায় দাঁড়াচ্ছে এই যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে তিনি যা ঘটতে দেখলেন তা এক ধাক্কায় সমাধান করে দিল তাঁর একটি মৌলিক সমস্যা— মানবতার প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার সূত্রে তিনি আগেই যেটির মুখোমুখি হয়েছিলেন। এর ফলে জীবনের অন্তিম পর্বে কবির চিন্তাভাবনা ও মানসিক প্রবণতা একটি মোড় ফিরল। তা বলে অবশ্য তিনি মার্কসবাদী বা কমিউনিস্ট হয়ে গেলেন না। জীবনের শেষ পর্বের বহু লেখাতেও তিনি মার্কসবাদ সম্বন্ধে তাঁর নানান আপত্তির কথা বলেছেন। সে যাই হোক না, তাঁর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কিন্তু তাঁর চিন্তাভাবনা ও প্রবণতার ওপর বিস্ময়কর রকমের ব্যাপক অভিঘাত এনেছিল। বাকি জীবনে তিনি কখনও ভুলতে পারেননি যে, বিরাট বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত কতক মৌলিক সমস্যা, বহু তত্ত্ববিদ্‌ই যেগুলিকে সমাধানের অতীত বলে মনে করেন, সেগুলি আসলে তা নয়। এসব সমস্যার সমাধান কার্যত সম্ভব। এবং মানবজাতির ইতিহাসের বৃহত্তম যে পরীক্ষা সোভিয়েত ইউনিয়নে ঘটতে দেখা গেল, তাতে প্রমাণ হলো যে প্রশংসনীয়

পথেই সেই সমাধান সম্ভব। কবির জীবনের বাকি দিনগুলোতে এটি একটি অনড় বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে যায়। তাই, তাঁর শেষ জন্মদিনের বাণী, তিনি যেটির নাম দিয়েছেন 'সভ্যতার সংকট', এবং যেটি আমাদের কাছে তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্র, তাতে আমরা পড়ি:

''আর দেখেছি রাশিয়ার মস্কাও নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আরোগ্যবিস্তারের কী অসামান্য অকৃপণ অধ্যবসায়— সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্য ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতা জাতিবিচার করেনি, বিশুদ্ধ মানব সম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে। তার দ্রুত এবং আশ্চর্য পরিণতি দেখে একই কালে ঈর্ষা এবং আনন্দ অনুভব করেছি। মস্কাও শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল; দেখেছিলেম, সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র-অধিকারের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোন বিরোধ ঘটে না; তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা। বহুসংখ্যক পরজাতির উপরে প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধান দুটি জাতির হাতে আছে— এক ইংরেজ, আর এক সোভিয়েট রাশিয়া। ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নির্জীব করে রেখেছে। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির। আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এই জাতিকে সকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর। সকল বিষয়ে তাদের সহযোগী ক'রে রাখবার জন্য সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের চেষ্টার প্রমাণ আমি দেখেছি এবং সে সম্বন্ধে কিছু পড়েছি। এইরকম গভর্নমেণ্টের প্রভাব কোন অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাতে মনুষ্যত্বের হানি করে না। সেখানকার শাসন বিদেশীয় শক্তির নিদারুণ নিষ্পেষণী যন্ত্রের শাসন নয়। দেখে এসেছি, পারস্যদেশ একদিন দুই য়ুরোপীয় জাতির জাঁতার চাপে যখন পিষ্ট হচ্ছিল তখন সেই নির্মম আক্রমণের য়ুরোপীয় দংষ্ট্রাঘাত থেকে আপনাকে মুক্ত করে কেমন করে এই নবজাগ্রত জাতি আত্মশক্তির পূর্ণতাসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। দেখে এলেম, জরথুষ্ট্রিয়ানদের সঙ্গে মুসলমানদের এককালে যে সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা ছিল বর্তমান সভ্যশাসনে তার সম্পূর্ণ উপশম হয়ে গিয়েছে। তার সৌভাগ্যের প্রধান কারণ এই যে, সে য়ুরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল। সর্বান্তঃকরণে আজ আমি এই পারস্যের কল্যাণ কামনা করি। আমাদের প্রতিবেশী আফগানিস্থানের মধ্যে শিক্ষা এবং সমাজনীতির সেই সার্বজনীন উৎকর্ষ যদিচ এখনো ঘটেনি কিন্তু তার সম্ভাবনা অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তার একমাত্র কারণ— সভ্যতাগর্বিত কোনো য়ুরোপীয় জাতি তাকে আজও অভিভূত করতে পারে নি। এরা দেখতে দেখতে চারিদিকে উন্নতির পথে, মুক্তির পথে অগ্রসর হতে চলল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে কবি যে উদ্দীপনা বোধ করেছিলেন তা তাঁর বিশ্বাসের এক সাময়িক পর্যায় মাত্র— এমন ভাবা অসম্ভব। ১৯৩০ সালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের সময় থেকে ১৯৪১ সালে তাঁর মৃত্যুর বছর পর্যন্ত কবির একরকম অবিচল বিশ্বাস থেকে গিয়েছিল যে, মানবতাবাদের যে স্বপ্ন তিনি চিরকাল দেখে এসেছেন, রুশ বিপ্লবের পথ অনুসরণ করলে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে তার রূপ দেওয়া যায়। অবশ্য, আর একটা ব্যাপারও আমি খুব ভালো করে জানি যে, কবির জীবনের এই শেষ দশ বছরের রচনা থেকেই এমন উদ্ধৃতিও দেওয়া যায় যা থেকে মনে হবে যে কবি ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর প্রথম জীবনের বৈশিষ্ট্যসূচক রোমান্টিক ভাবাবেশ আর ঔপনিষদীয় আদর্শে প্রতি তীব্র আকর্ষণের জগতে। তা সত্ত্বেও, কবির জীবনের শেষ দশ বছরে যে তাঁর সামগ্রিক প্রবণতার এক ধরনের মৌলিক পরিবর্তন হয়েছিল, নীহাররঞ্জন রায়, খুবই যুক্তিসঙ্গতভাবে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব চিন্তাজগতের এই মৌলিক পরিবর্তন না বুঝতে পারলে তাঁর পরিণততম দিনগুলিতে তাঁকে বোঝা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু কবির চিন্তাজগতে সবচেয়ে মৌলিক যে পরিবর্তনটি হয়েছিল সেটিকেও আবার বোঝা যাবে না, যদি না এই কথা খেয়াল হয়েছিল সেটিকেও আবার বোঝা যাবে না, যদি না এই কথা খেয়াল রাখা যায় যে সেটি শুরু হয়েছিল ১৯৩০ সালে, যখন তিনি মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা সরাসরি অর্জন করেছিলেন।

এ ছাড়াও আরও কয়েকটা কথা এখানে বলা দরকার। ১৯৩০ সালে কবি যখন রাশিয়ায় যান, তখন সেখানে ধর্মের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রচারের ওপর খুব জোর দেওয়া হচ্ছিল। যে কবির নিজের ছিল প্রগাঢ় ধর্মবিশ্বাস, শান্তিনিকেতন আশ্রমের সেই ঈশ্বর-আপ্লুত গুরুদেবের এতে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল? খুব কম করে বললেও, তাঁর যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা খুবই অপ্রত্যাশিত। তিনি নিজেই লিখেছেন:

''যে পুরাতন ধর্মতন্ত্র এবং পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্র বহু শতাব্দী

ধরে এদের বুদ্ধিকে অভিভূত এবং প্রাণশক্তিকে নিঃশেষপ্রায় করে দিয়েছে এই সোভিয়েট-বিপ্লবীরা তাদের দুটোকেই দিয়েছে নির্মূল করে, ... কেননা, যে ধর্ম মূঢ়তাকে বহন করে মানুষের চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট করে, কোনো রাজাও তার চেয়ে আমাদের বড়ো শত্রু হতে পারে না— সে রাজা বাইরে থেকে প্রজাদের স্বাধীনতা যতই নিগড়বদ্ধ করুক না। এ পর্যন্ত দেখা গেছে, যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায়ক সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম বিষকন্যার মতো; আলিঙ্গন ক'রে সে মুগ্ধ করে, সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেননা তার মার আরামের মার।

সোভিয়েটরা রুশসম্রাটকৃত অপমান এবং আত্মকৃত অপমানের হাত থেকে এই দেশকে বাঁচিয়েছে— অন্য দেশের ধার্মিকেরা ওদের যত নিন্দাই করুক আমি নিন্দা করতে পারব না, ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো।"

কবির নিজের বিচারে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে মার্কসীয় অর্থনীতির সপক্ষে প্রচারে নিঃসন্দেহে কিছুটা বাড়াবাড়ি হয়েছিল। কিন্তু তবুও ধৈর্যসহকারে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা কবির ছিল। তিনি বললেন:

"তারা বলে, ওসব কথা পরে হবে, আপাতত কাজ উদ্ধার করে নিই। রাশিয়ার অবস্থা যুদ্ধকালের অবস্থা। অন্তরে বাহিরে শত্রু। ওখানকার সমস্ত পরীক্ষাকে পণ্ড করে দেবার জন্যে চারিদিকে নানা ছলবলের কাণ্ড চলছে। তাই ওদের নির্মাণকার্যের ভিতটা যত শীঘ্র পাকা করা চাই, এ জন্যে বলপ্রয়োগ করতে ওদের কোনো দ্বিধা নেই।"

অবশ্য কবি যে সত্যই এই পদ্ধতি অনুমোদন করেছিলেন তা নয়; বরং রুশীয়রা যদি বলপ্রয়োগ না করেই কাজ চালাতে পারত তাহলেই তিনি খুশি হতেন। তাই তিনি আরও বলেছেন, "কিন্তু গরজ যত জরুরিই হোক, বল একতরফা জিনিস। ওটাতে ভাঙে, সৃষ্টি করে না।"

একই সঙ্গে, কবি আমাদের লক্ষ্য করতে বলেছিলেন আরও একটি অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার। শোষকসমাজের ইতিহাসের আগাগোড়াই মৌল মানবতাকে ধ্বংস করার জন্য অন্য এক ধরনের কৌশলও কাজ করে গেছে। সেটি কিন্তু কোনো পাশবশক্তি নয়। সেটি হলো মতাদর্শের, বিশেষত ধর্মীয় মতাদর্শের, সুচতুর ব্যবহার। আর রুশবিপ্লব যে এই জাতীয় পীড়নকেও উৎখাত করেছিল, তাতে কবি খুশিই হয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন:

"যারা যথার্থই দৌরাত্ম্য করতে চায় তারা মানুষের মনকে মারে আগে; এরা মনের জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তুলেছে।"

আর একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছেই সম্ভবত যা আশা করা যায় তাই হল: তৎক্ষণাৎ কবির মনে এল তাঁর দেশবাসীর কথা, এবং যুগ যুগ তাদের ওপর জবরদস্ত ধর্মের যে পীড়ন চলেছে তার কথা। মাত্র কয়েক বছরে এইসব পীড়ন থেকে সোভিয়েত রাশিয়াকে মুক্তি পেতে দেখেছিলেন তিনি। তাঁর নিজের কথায়:

"নিজের দেশের চাষীদের মজুরদের কথা মনে পড়ল। মনে হল আরব্য উপন্যাসের যাদুকরের কীর্তি। বছর দশেক আগেই এরা ঠিক আমাদেরই দেশের জন-মজুরদের মতোই নিরক্ষর নিঃসহায় নিরন্ন ছিল, তাদেরই মতো অন্ধ সংস্কার এবং মূঢ় ধার্মিকতা। দুঃখে বিপদে এরা দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়েছে, পরলোকের ভয়ে পাণ্ডা-পুরুতদের হাতে এদের বুদ্ধি ছিল বাঁধা, আর ইহলোকের ভয়ে রাজপুরুষ, মহাজন ও জমিদারের হাতে; যারা এদের জুতো-পেটা করত তাদের সেই জুতো সাফ করা এদের কাজ ছিল। হাজার বছর থেকে এদের প্রথাপদ্ধতির বদল হয়নি; যান-বাহন চরকা-ঘানি সমস্ত প্রপিতামহের আমলের, হালের হাতিয়ারে হাত লাগাতে বললে বেঁকে বসত। আমাদের দেশের ত্রিশ কোটির পিঠের উপর যেমন চেপে বসেছে ভূতকালের ভূত, চেপে ধরেছে তাদের দুই চোখ— এদেরও ঠিক তেমনই ছিল। ক'টা বছরের মধ্যে এই মূঢ়তার অক্ষমতার অভ্রভেদী পাহাড় নাড়িয়ে দিলে যে কী করে সে কথা এই হতভাগ্য ভারতবাসীকে যেমন একান্ত বিস্মিত করেছে এমন আর কাকে করবে বলো।"

১৯৩০-এ ভারতে এরকম কথা বলবার সাহস ছিল শুধু চূড়ান্ত র‍্যাডিকালদেরই। যদিও রবীন্দ্রনাথের মতো এত জোরালো ভাষায় আর এত আবেগের সঙ্গে বলার মতো কেউ ছিলেন না।

কিন্তু এবার আমাদের আরেকটি প্রসঙ্গে যাওয়া দরকার। যখন কবির এই নতুন উপলব্ধি হল, তখন তাঁর আগেকার ধর্মীয় বিশ্বাস, বিশেষ করে প্রথম জীবনের ঔপনিষদিক ধ্যান-ধারণার প্রতি তাঁর আস্থার কী হল? তিনি কি এ সমস্ত কিছুকে একেবারে বর্জন করার মতো পর্যায়ে চলে গেলেন বা আদৌ ঐরকম পর্যায়ে যেতে পারতেন? উত্তর হল— না, তিনি যাননি। তাহলেও তিনি যা চেষ্টা করলেন সেটা একটা আলাদা ব্যাপার। তিনি আনতে চাইলেন তাঁর এই নতুন উপলব্ধি আর পুরোনো বিশ্বাসের মধ্যে একটা কাজচালানো গোছের বোঝাপড়া। যেভাবে তিনি এটি করলেন, তা খুব কম

করে বললেও, সত্যিই অসাধারণ। বলশেভিকদের সার কথাগুলোকে তিনি দেখতে পেলেন প্রাচীন উপনিষদে। তাঁর নিজের কথায়:

''উপনিষদের একটা কথা আমি এখানে এসে খুব স্পষ্ট করে বুঝেছি— 'মা গৃধঃ', লোভ কোরো না। কেন লোভ করবে না। যে-হেতু সমস্ত কিছু এক সত্যের দ্বারা পরিব্যাপ্ত; ব্যক্তিগত লোভেতেই সেই একের উপলব্ধির মধ্যে বাধা আনে। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'— সেই একের থেকে যা আসছে তাকেই ভোগ করো। এরা আর্থিক দিক থেকে সেই কথাটা বলছে। সমস্ত মানবসাধারণের মধ্যে এরা একটি মানবসত্যকেই বড়ো বলে মানে— সেই একের যোগ উৎপন্ন যা-কিছু, এরা বলে, তাকেই সকলে মিলে ভোগ করো— 'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধন্য'। কারো ধনে লোভ কোরো না। কিন্তু ধনের ব্যক্তিগত বিভাগ থাকলেই ধনের লোভ আপনিই হয়। সেইটিকে ঘুচিয়ে দিয়ে এরা বলতে চায়, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।''

এসব উদ্ধৃতি সুপরিচিত। এগুলি নেওয়া ঈশ-উপনিষদ্ থেকে— শঙ্কর থেকে শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত অনেকেই যার টীকা রচনা করেছেন। আমি অবশ্য জানি না, তাঁরা এবং তাঁদের অনুগামীরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কতটা একমত হবেন এবং জীবনের বস্তুগত দিকগুলি সম্বন্ধে বলশেভিকদের যা সার কর্মসূচি, উপনিষদে তার কতটা প্রতিফলন তাঁরা দেখতে পাবেন। কিন্তু সেটা অন্য ব্যাপার, যা নিয়ে আলোচনা আপাতত স্থগিত থাক। আমরা এখন রবীন্দ্রনাথকে বোঝার চেষ্টা করছি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কি আমরা নিজেদের একটা সরল প্রশ্ন করতে পারি? কবি কি তাঁর পুরনো ধারণায় আরোপ করতে চাইছিলেন কোনো শর্ত? এমন কি হতে পারে যে, তিনি উপনিষদ্‌কে গ্রহণ করছিলেন এই শর্তে যে তা বলশেভিক কার্যসূচিকে গ্রহণ করবে? প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা এর উত্তর না পেলে আমরা কবির জীবনের শেষ পর্যায়টি প্রায় বুঝতেই পারব না।

এর সঙ্গে আমি আর একটিমাত্র কথা যোগ করতে চাই। রবীন্দ্রনাথের ওপর বলশেভিক বিপ্লবের প্রবল অভিঘাত অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কবিকে যাঁরা বিশুদ্ধ নান্দনিক বা বিশুদ্ধ মিস্টিক হিসেবে খাড়া করতে চান, তাঁদের কাছে তথ্যটি অস্বস্তিকর। সুতরাং তাঁরা ব্যাপারটিকে কবির একটা সাময়িক আবেগের উচ্ছ্বাস হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু এই প্রয়াস কি কবির অনুমোদন পেত? এর উত্তর দেওয়ার আগে আমাদের ফিরে ফিরে পড়তে হবে তাঁর অন্তিমবাণী— 'সভ্যতার সংকট'। বার বার সেটি পড়লে আমরা একটি সহজ সত্যকে এড়াতে পারব না। ১৯৪১ সালে কবি দেখলেন ইওরোপীয় সভ্যতা এক তীব্র সংকটের কবলে। কিন্তু একটি ব্যতিক্রমও রয়েছে। সমাজবাদী সভ্যতায় কোনো সংকট তিনি দেখতে পেলেন না। তার বদলে সেখানে দেখলেন ভবিষ্যতের আশা। সমাজবাদী সভ্যতায় তিনি কী দেখেছিলেন তা আমরা যতদিন না বুঝতে পারছি, ততদিন আমরা বুঝব না রবীন্দ্রনাথকে, অন্তত বুঝব না তাঁর জীবনের অন্তিম পর্বটিকে।

সংযোজন

এই বক্তৃতার কিছুদিন পরেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘাতকের হাতে প্রাণ দেন। বেতার আর দূরদর্শনে দেখলাম, 'কঠ-উপনিষদ্' ও 'গীতা'র যে কথাগুলির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ অত তিক্ত মন্তব্য করেছিলেন সেগুলোই কিছু পণ্ডিত আবৃত্তি করছেন। দেশবাসীকে সান্ত্বনা দেওয়া ও হয়ত বা শ্রীমতী গান্ধীর আত্মার আশিসের জন্য সংস্কৃত শ্লোক আওড়ানো হচ্ছে— এটা তো বুঝলাম। কিন্তু যেটা বুঝলাম না সেটা এই যে, 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'-র সঙ্গে তো মৃত্যু— বা সাধারণত আমরা যাকে বলি স্বাভাবিক মৃত্যু— তার কোন যোগ নেই! এতে বলা হয়েছে 'হননকারী' ও 'হত ব্যক্তি'র কথা, 'খুনী' ও 'খুন হওয়া লোকে'র কথা, খুনের পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের কথা। উপনিষদ্ ও 'গীতা' এই সবকিছুকেই নেহাতই কল্পনার ছায়া বলে আমাদের বোঝাতে চায়। 'খুনী' ও 'খুন হওয়া লোকের' কথা, খুনের পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের কথা। উপনিয়দ্ ও 'গীতা' এই সবকিছুকেই নেহাতই কল্পনার ছায়া বলে আমাদের বোঝাতে চায়। 'খুনী' ও 'খুন হওয়া' আমার কাছে তখন অন্তত খুবই কুৎসিত রকমের বাস্তব, বিতর্কের অতীত বাস্তব বলে মনে হয়েছিল। যে দর্শন এই সব কিছুকে অজ্ঞের কল্পনা বলে মেনে নিতে বলে তার প্রতি আমি কোন শ্রদ্ধা রাখতে পারি নি।

কোন ব্যক্তিগত আবেগ প্রকাশ করার জন্য এ কথা বলছি না। আমি শুধু এই ব্যাপারেই জোর দিতে চাই যে, বাহ্যত পবিত্র যে-কোন সংস্কৃত শ্লোক সুর করে আওড়ালেই সেটা পবিত্র হয়ে যায় না।

জানি না, বেতার ও দূরদর্শনের উদ্যোক্তারা আমার সঙ্গে একমত হবে কিনা। কিন্তু আমি তাঁদের জবাবটা জানতে পারলে খুশি হতাম।

সমাপ্ত

পরিচয়, শারদীয় ১৯৮৬

অসংগঠিত মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই

বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পর্ব

এইবার যে আন্দোলনের কথা লিখব, সেই আন্দোলনটি ‘মিডিয়া’য় তেমন প্রচার পায় নি। তার প্রধান কারণ অবশ্যই ১৯৯৫ সালে ভুবনায়নের হাওয়া এভাবে ঝড় হয়ে ওঠে নি। সাধারণ মানুষ তখনও নিজেদের অভিজ্ঞতায় রাষ্ট্রকে বহুজাতিকের প্রতিনিধি হয়ে জমি দখল করতে দেখে নি।

গোপালপুর প্রকল্প

ওড়িশার গঞ্জাম জেলার ব্রহ্মপুর আর ছত্রপুর ব্লক মিলিয়ে প্রায় ৭ হাজার একর জমির ওপর ‘স্টিল প্লান্ট’ হবে এই মর্মে ওড়িশা সরকার আর ‘টিস্‌কো’র মধ্যে ‘মউ’ স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের নাম হয় ‘গোপালপুর প্রকল্প’। ২৫টি গ্রাম এবং গ্রামবাসীদের খেত এই প্রকল্পের আওতায় পড়ে। ’৯৫ সালেই গ্রামবাসীরা মিলে নিজেরাই তৈরি করেন ‘গণ সংগ্রাম সমিতি’। ’৯৬ সালে লাঠি, গুলি, আগুনের সাহায্যে ৪ হাজার একর জমির দখল নেয় সরকার। ২ জন গ্রামীণ মহিলা শহীদ হন। ৩০ হাজার মানুষকে উৎখাত করা হয়; গৃহহীন হয়ে পড়েন তাঁরা। কিন্তু ২৫ বছর পরও সেই জমিতে কোনও কারখানা তৈরির সূচনাও হয় নি। এমনকি, পাঁচিলও দেওয়া হয় নি। বন্দুকধারী পাহারা বসিয়ে জমির অধিকার বজায় রেখেছে সরকার। নানা কারণে ‘গণ সংগ্রাম সমিতি’ ভেঙে গেলেও, আন্দোলন থেমে থাকে নি। নতুন করে তৈরি হয়েছে ‘সমাজ সুরক্ষা সমিতি’। ৪ হাজার একর অধিগৃহীত জমির ক্ষতিপূরণেও টাকা এখনও মেটাতে পারে নি সরকার। ‘সমাজ সুরক্ষা সমিতি’র পক্ষ থেকেও পাহারা দেয় যাতে তাদের এড়িয়ে কেউ ঢুকে দখল না নিতে পারে। আর সরকার পাহারা দেয় যাতে সাধারণ গ্রামবাসী ঢুকতে না পারে। এই জমির ভিতরে একটি শিবমন্দির আছে। কেবল সেই মন্দিরের পূজারি এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে।

এই প্রসঙ্গে আমার আরও একটি-দু’টি অভিজ্ঞতার কথা লিখি। যে ৭টি গ্রামের দখল সরকার নিতে পেরেছিল, সেগুলি হল : সিন্ধিগাঁও, পাত্রপুর, বাদপুর, কানিপল্লি, পাইকপাড়া, পলিগুড়ি ও চমাখণ্ডি। এই দখলীকৃত গ্রামগুলির মধ্যে সিন্ধিগাঁও-এ সবচেয়ে বেশি জমি বিক্রি হয়েছে। এই জমি যাঁরা বিক্রি করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই সিন্ধিগাঁও-এর বাসিন্দা নন। জমির ওপর নির্ভরশীলও নন। জমির মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে সরকার জমি কিনে নিয়েছে। চাষ করেন যিনি, তিনি জানতেও পারেন নি। এখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, যিনি চাষ করেন, তাঁর অবস্থা একেবারে ভূমিহীন নয়। হয়ত মালিকের ১০ একরের সঙ্গে নিজের ২ একর জমিও নিজেই চাষ করেন। বড় বড় জমি বিক্রি হয়ে যাবার পর ছোট জমির মালিকও বিক্রি করে দেন। কারণ তাঁদের মনে হয়েছিল, এই আগ্রাসন থেকে তাঁদের অল্প কিছু জমিকে বাঁচানো অসম্ভব। তবুও খুব সহজে এ কাজ হয় নি। লাঠি, গুলি, ডেপুটেশন— এসবের খুব বড় একটা ভূমিকা ছিল। ২০০ জনের বিরুদ্ধে এখনও মামলা চলছে। মনে রাখতে হবে, ২০ বছর আগে এই ঘটনা যখন ঘটেছে, তখনও সাধারণ মানুষ বহুজাতিকের সঙ্গে রাষ্ট্রের আঁতাত বিষয়ে ততটা ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তবু নিজেদের সাধ্যমতো বাধা দিয়েছিলেন তাঁরা।

যাই হোক, একর প্রতি ১ লাখ এবং জমি ছাড়াও বসতবাটি হারাবেন যাঁরা, তাঁদের ২৬ স্কোয়ার মিটার জমির ওপর বাড়ি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ওড়িশা সরকার।

সিন্ধিগাঁও-এর কথায় ফিরে আসি। সিন্ধিগাঁও-এর সমৃদ্ধির

কাহিনী যখন শুনেছি, আমার মনে হয়েছিল রূপকথার গল্প। '৯৬ সালে সিন্ধিগাঁও-এর কৃষক পরিবারগুলি ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা রোজগার করতেন হেসে-খেলে। সেচের জল ছাড়াও টিউবওয়েল ছিল। প্রত্যেক পরিবারের অন্তত তিন চার ঘরের বাড়ি ছিল। ৭টি গ্রাম মিলিয়ে একটি আপার প্রাইমারি ও একটি হাইস্কুল ছিল। আর একাধিক প্রাইমারি স্কুল। সবচেয়ে অবাক হয়ে শুনেছি, ২০ একর সরকারি জমিতে বনসৃজন করেছিলেন তাঁরা। সেই বনে আশপাশের সব গরু, ছাগল চরতে আসত। জ্বালানির কাঠ পেতেন গ্রামবাসীরা। আবার কাঠের জন্য ইজারা দিয়ে, সেই টাকাতেই গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতেন। বনসৃজন করা হয়েছিল বলে খাজনা দিতে হত না।

এখানকার গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তিটি দাঁড়িয়ে আছে কেওড়া ফুলের চাষের ওপর। তাই কেওড়া নিয়ে দু'চার কথা বলা খুব জরুরি। ওড়িশার গঞ্জাম থেকে অন্ধ্রের শ্রীকাকুলাম পর্যন্ত উপকূল ধরে ছাড়া কেওড়া চাষ হয় না। কেওড়ায় কোনও সার দেওয়া যায় না। এই অঞ্চলের মাটি এবং মাটির তলার জল ছাড়া কেওড়া ফুলের গন্ধ আসে না। ১৫/২০ বছর আগে ঐ ফুলটি কালোবাজারে এক একটি ২৫ টাকায় বিক্রি হত। দুই থেকে আড়াই একর জমিতে এক কিলো কেওড়া হয়। তার দাম তখনই ছিল ৪ লাখ টাকা। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই চাষ এবং নির্যাস বের করা নিয়ে ওড়িশা সরকারের কোনও পরিকল্পনা নেই। ১৮৯২ সালে একটি কারখানা তৈরি হয়েছিল, এখনও তাই-ই আছে!

যেসব বাচ্চারা সিন্ধিগাঁও-এ স্কুলে যেত তাদের স্কুল ছাড়িয়ে কাজে লাগাতে হয়েছে কারণ শিশুশ্রম ছাড়া সংসার অচল।

অধিগৃহীত জমির এই ৭টি গ্রামের মানুষকে পুনর্বাসন দেবার দায়িত্ব নিয়েছিল ওড়িশা সরকার। কিন্তু এতগুলি মানুষের পুনর্বাসন তো সহজ কথা নয়! তার জন্যও জায়গা চাই। '৯৬ সালে গ্রাম ছেড়ে, জীবিকা ছেড়ে পুনর্বাসিত মানুষ টাটা কলোনিতে উঠে আসেন। একটা ছোট ঘর, রান্নাঘর, সামনে সামান্য জায়গা। জলের জন্য কুয়ো আর বিদ্যুতের খরচ টাটা বহন করবে— এইরকমই কথা ছিল। কিন্তু ৩ বছর পর থেকেই বিদ্যুতের বিল, রাস্তা বা কুয়ো মেরামতি ইত্যাদি থেকে টাটা হাত উঠিয়ে নেয়। একদিন সুগন্ধি ফুল, নানা জাতের চাল, ডাল, তরিতরকারি ফলাতেন যাঁরা, টাটা কলোনির সেই কৃষক রমণীরা বাস্তুচ্যুত, জীবিকাচ্যুত হয়ে প্রতিদিন ১০-১২ কিলোমিটার হেঁটে যান ব্রহ্মপুর বা অন্যত্র নির্মাণ কাজের যোগাড়ের কাজের সন্ধানে। সেখানে নিয়মিত এ কাজ মেলে না। কাজ মিললেও মজুরি দেন না ঠিকেদারেরা। বছর পাঁচেক আগে তাঁরা বলেছিলেন, তাঁদের মজুরি ছিল ৬০ টাকা, কিন্তু ৫৫ টাকাই চলে যায় দিন চালাতে। আগে গ্রামে থাকার সময় অনেক কিছুই তাঁদের কিনতে হত না। কিন্তু টাটা কলোনিতে সব কিছুই টাকা খরচ করে কিনতে হয়। ফলে কেবল খাওয়া খরচে যদি ৫৫ টাকা চলে যায়, তাহলে জামা-কাপড়, ওষুধপত্রের জন্য আর কিছুই থাকে না। যেসব বাচ্চারা সিন্ধিগাঁও-এ স্কুলে যেত তাদের স্কুল ছাড়িয়ে কাজে লাগাতে হয়েছে কারণ শিশুশ্রম ছাড়া সংসার অচল। এইসব করার পরও অনেক বাড়িই খালি। কারণ অনেকেই কাজের খোঁজে সপরিবার দেশান্তরি হয়েছেন। আর যাঁরা মাটি কামড়ে পড়ে আছেন, তাঁদেরও অধিকাংশ বাড়িতে পুরুষরা নেই। কাজের খোঁজে বাইরে গেছেন। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে যে পুনর্বাসনের ঘোষণা হয়, তার ভেতরের চেহারাটা কেমন, এটা বোঝাতেই এত কথা।

এই পুনর্বাসনের ভিতরের আর এক উচ্ছেদের কাহিনী আছে। ৭টি গ্রামের মানুষের জন্য যে 'টাটা কলোনি' গড়ে উঠল, সেই কলোনি গড়ে তুলতে ৫০০ একর জমির দরকার ছিল সরকারের। সেই জমির জন্য শীতলা পল্লী আর লোহাঝুড়ি নামের দুটি গ্রামকে চিহ্নিত করা হয়। সেখানকার মানুষকে একরকম জোর করেই তুলে দেওয়া হয়। দালাল মারফত দাম ঠিক হয়। যে যেমন পেরেছেন, দাম ঠিক করেছেন। একা দাম না পেয়ে, ভয়ে ছেড়ে গেছেন, এমনও শোনা যায় জীবিকা হারানো, ভিটে হারানো এই মানুষগুলি গেলেন কোথায়, কী করেন এখন? এসব প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই।

পুনর্বাসনের ভেতরের উচ্ছেদের কাহিনী তেমন প্রচারও পায় না। এলাকার একটি বাচ্চা ছেলে আমায় বলেছিল, 'এই যে যেখানে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, সেইখানে আমার বন্ধুর বাড়ি ছিল। ওরা চলে গেছে। ওদের বুড়ো দাদুকে ব্রহ্মপুর স্টেশনে ফেলে রেখে গেছে। দাদু ওখানেই ভিক্ষে করে। আমি ব্রহ্মপুর গেলে, দাদুকে পাঁউরুটি কিনে দিয়ে আসে।'

ক্রমশ

একটি শিশুর মৃত্যু

ভবানীপ্রসাদ সাহু

বিয়ের বছরখানেক পরেই নমিতার বাচ্চা হল। ফুটফুটে ছেলে। একটু রোগা, ওজনটাও কম। তবে অন্য অসুবিধা হয় নি। ক্লাস নাইনে পড়ার সময়ই বছর ১৬-র নমিতার বিয়ে হয়ে যায় তিন চারটে গ্রামের পরে। বরের জমি আছে, ধানভাঙার মেশিন আছে। মোটামুটি সচ্ছল। তবে বাড়িতে আর বৌ নেই। বিয়ের পর থেকেই পুরো সংসার বলতে গেলে নমিতার ওপর। পেটে বাচ্চা থাকার সময়েও।

ওর পড়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পড়াশোনায় এমন কিছু ভাল নয়। তার ওপর গরিব বাড়ির মেয়ে। তাই সম্বন্ধ আসতেই বাবা-মা আর দেরি করেন নি।

বাচ্চা হওয়ার পর শাশুড়ি বললেন, প্রথম দুধটা ফেলে দিও বউমা। সত্যিই তো কেমন ঘন, হলদেটে দুধ! না, নমিতা বাচ্চাকে দেয় নি। তারপর আর অসুবিধে নেই। বুকে দুধ আছে যথেষ্টই। তবে যেদিন কাজের চাপে দুপুর গড়ানোর আগে কিছু খেতে পারে না, সেদিন যেন দুধটা ঠিকমতো আসে না। তখন শাশুড়ির কথায় ঘরের গরুর দুধ গরম করে ঝিনুকে করে খাওয়ায় মাস দেড়েকের বাচ্চাকে।

পিসিশাশুড়ি খবর পেয়েছিলেন দেরিতে। তিনি সেদিন দেখতে এলেন, সঙ্গে তাঁর দুই মেয়ে। একজনের ৯ বছর, আরেকজনের ১২ বছর। ঘণ্টা তিনেক বাসে। তারপর বেশ খানিকটা কাদা রাস্তা পেরিয়ে আসতে হয়। বাচ্চা দেখে তারা খুব খুশি, বাচ্চার জন্য ছোট্ট জামা, দুধের বোতল, লাল ঝুমঝুমি কত কি এনেছে। ঘরে ঢুকেই বাচ্চাকে কোলে তুলে আদর করতে লাগলেন পিসি। মেয়েকে বলল, দেখ, দেখ চোখ দুটো ঠিক নবর মতো। নব মানে নমিতার স্বামী। মেয়ে দুটো কাড়াকাড়ি করে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে, দুলিয়ে, হামি খেয়ে আদর করতে লাগল।

নমিতা রান্নাঘরে ছিল, এসে দেখে বাচ্চাটাও এমন আদর পেয়ে বেশ চুপ করে গেছে। কিন্তু তবু ওর মনে হল, জীবনবিজ্ঞানে যেন পড়েছিল, এত ছোট বাচ্চাকে এমন রাস্তার জামাকাপড় না ছেড়ে, হাত না ধুয়ে কোলে নিয়ে জড়িয়ে ধরে আদর করা ঠিক নয়। মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারছে না। কুটুম মানুষ, অনেক দিন পর এসেছেন। কিন্তু যখন দেখল ছোট মেয়েটা হামি খেতে খেতে বাচ্চাটাকে দোলাচ্ছে তখন আর থাকতে পারল না। বলে ফেলল, এই পড়ে যাবে তো! আর হাতমুখটা ধুয়ে নাও না।

পিসিশাশুড়ি নমিতার শাশুড়ির সঙ্গে পাশেই গল্প করছিলেন। কিন্তু নমিতার কথাটা ঠিক কানে গেছে। শুনেই ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, কেন আমরা নোংরা হয়ে আছি নাকি! আমরাও বাচ্চা মানুষ করেছি। শাশুড়ি আবার ফোড়ন কাটলেন, এই হয়েছে আজকালকার মেয়েদের কথাবার্তা। দু পাতা ইস্কুলে পড়েছে, এদিকে ঘরের কাজ সব পড়ে।

নমিতা আর দাঁড়ায় নি। ক'দিন সবার কোলে কোলে বেশ আনন্দেই কাটাল বাচ্চাটা। সবাই চলে যাওয়ার দিনদুয়েক পর থেকে বাচ্চাটা আবার পাতলা পায়খানা করতে শুরু করল। সঙ্গে খুকখুকে কাশিও। শাশুড়ি বললেন, বুকের দুধ আর দিও না বৌমা, বোতলে করে দুধ খাওয়াও।

বোতল গরম জলে ধুয়ে তাই করল নমিতা। সঙ্গে সলতে ভিজিয়ে জল। তাই কেমন চুকচুক করে টানছে বাচ্চাটা। কিন্তু পেট খারাপ আর কমে না। গাটাও যেন গরম, কাশছেও।

দিনদুয়েক এভাবে কাটার পর নমিতা একবার বলল, ডাক্তারখানায় নিয়ে গেলে হত। ডাক্তারখানা বলতে ঐ মাইল তিনেক দূরে হেল্‌থ সেন্টার। মহকুমা হাসপাতাল আরো দূরে। নমিতা বলল, হেল্‌থ সেন্টারে তো কিস্যু নেই। ডাক্তারই আসে হপ্তায় দু দিন। সিস্টার দিদিমণি থাকে ৫ দিন। এদিকে আবার বর্ষা— কাদার সময়।

শাশুড়ি বলল, ও কিছু নয় বৌমা, নজর লেগেছে। দাঁড়াও শেতলাতলার মাদুলি এনে দিচ্ছি। দেওয়া হল। ক'দিন ধরে বেশ বাড়াবাড়ি। বাচ্চা হাঁপাচ্ছে। বেশ জ্বর। সঙ্গে পাতলা পায়খানা। মাঝরাতে নমিতা হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল। নব

বিরক্ত হয়ে বলল, দাঁড়াও সকালে অসিত ডাক্তারকে ডাকছি।

অসিত ডাক্তার থাকেন পাশের গ্রামে। তিনিই ওখানকার সব রোগী দেখেন। নমিতার তাড়ায় সক্কালবেলা নব গেল ওঁর বাড়ি। উনি তখন দাঁত মাজছেন। নবর মুখে সব শুনে বললেন, দাঁড়াও নবদা, মুখে কিছু দিয়েই যাচ্ছি।

অসিত এসে ও আর এস দিল, বড়ি গুঁড়ো করে দিল, তারপর জানাল মনে হয় স্যালাইন দিতে হবে। তার থেকে তুমি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাও। কিন্তু আজ তো রবিবার। তবে ইমার্জেন্সিতে কেউ না কেউ থাকবে।

নমিতার কান্নাকাটিতে নব বেরিয়ে পড়ল। অবশ্য একটু দেরি হল। একজনের ক'মণ ধান কাল থেকে পড়ে আছে, আজ না ভাঙালেই নয়। শাশুড়ি আবার বললেন, নবর এরকম পেট খারাপ কাশিতে আমরা তো গাঁদাল পাতা আর তুলসী পাতার রস খাইয়েই সারিয়েছি। এত বড়টা করেছি। আজকাল হয়েছে সব হাসপাতাল আর শহরে ঘোরার ধান্দা।

তবু বাচ্চাটা যখন নেতিয়ে পড়তে থাকল নমিতা আর সব ভুলে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি একাই বাচ্চাকে নিয়ে যাচ্ছি, তখন আর শাশুড়ি আপত্তি করেন নি। মেশিনের কাজটা সেরে বাচ্চাকে নিয়ে নব আর নমিতা বেরোল। মাইল খানেক কাদা রাস্তায় হেঁটে মোরামের রাস্তা। একটু দাঁড়াতে ভ্যানরিক্সা এল। ঐ রিক্সাতেই আসছিল ওখানকার স্বাস্থ্যকর্মী দিদিমণি। বোনের বিয়ের জন্য সে আবার ক'দিন ছিল না। সে দেখেই বলল, বাচ্চা তো খুব ভাল দেখছি নারে নমিতা।

বাচ্চাটাকে বুকে আঁকড়ে নমিতা চলল ভ্যানরিক্সায়। তারপর বাসে প্রায় ঘণ্টাখানেক। রাস্তারও এমন অবস্থা, নাচতে নাচতে যাচ্ছে। বাচ্চাটা না পড়ে যায়।

মহকুমা হাসপাতালে ইমার্জেন্সিতে সেদিন আবার বেশ ভীড়। একে রোগীর ভীড়, তার ওপর এক মন্ত্রী আসছেন। রোববার বলে আউটডোর বন্ধ। সিস্টার গেটে ফুল সাজানোর তদারকি করছেন। ডাক্তারবাবু একবার একটা রোগী দেখছেন, আবার— অ্যাই, মন্ত্রী এসে তো ঐ চেয়ারে বসবেন, বলে নির্দেশ দিচ্ছেন। সবাই ব্যস্ত।

এমন সময় নমিতারা এল বাচ্চা নিয়ে। বাচ্চাটার চোখ আধবোজা, বুক হাপরের মতো ওঠানামা করছে, একেবারে নেতিয়ে পড়া। কে যেন বলল, ডাক্তারবাবু এই বাচ্চাটাকে একবার তাড়াতাড়ি দেখুন। ধ্যাত, এখন আবার এই সব আধমরা কেন, বলে ডাক্তারবাবু একটু দেখেই বুঝলেন গড়বড় অবস্থা। বাচ্চাটাকে মেরে এনেছ, বলে খেঁকিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু নিশ্চুপ নমিতার শ্যামলা রোগা করুণ মুখ, শুকিয়ে যাওয়া চোখের জলের ধারা দেখে চুপ করে গেলেন।

মা, এ তো খুব খারাপ অবস্থা গো। আমি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোমরা কলকাতার বেলেঘাটার শিশু হাসপাতালে নিয়ে চলে যাও।

পাশ থেকে এক জিডিএ ফিসফিস করে যেন বলল, ডাক্তারবাবু একটা চ্যানেল করে দিলে হত না!

আরে এর তো শিরাটিরা কিচ্ছু নেই। তবু দেখি। সিস্টার, সিস্টার। দামি অ্যান্টিবায়োটিক কিনতে পারবে তো? কোনো রকমে একটা চ্যানেল করে স্যালাইন চালানো হল। একটা ইনজেকশানও দেওয়া হল। তাই নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে কলকাতা। ড্রাইভার কিছুতেই যাবে না। নব তাকে ২০০ টাকা দেবে কথা হল। সে আবার নার্সিংহোমের কথা বলছিল। জানা গেল রবিবার ওখানে বাচ্চার ডাক্তার থাকে না। আর এর তো শেষ অবস্থা। নার্সিংহোমে মনে হয় নেবেও না।

ঘণ্টা চার-পাঁচেক লাগল বেলেঘাটা পৌঁছতে। ইতিমধ্যে স্যালাইন চালানো হাতটা ফুলে গিয়েছে। নমিতার মনে হচ্ছিল অনন্ত পথ। দেখা গেল আরো বহু মা নমিতার মতো এসেছে ঐ রকম বাচ্চা নিয়ে। হাসপাতাল ভিড়ে ভিড়াক্কার। আজ সারাদিনে ৫টা বাচ্চা মারা গিয়েছে। নার্সরা বলছে, তোমরা বাচ্চাটাকে একেবারে মেরে সবশেষে এখানে আসো কেন বল তো?

এর কোনো উত্তর নমিতার কাছে নেই। অথচ আছেও। কেন এত দেরি পরপর তা বলতে বসলে মহাভারত হয়ে যাবে। ভর্তির ঘণ্টাতিনেক পরে নমিতার বাচ্চাটাও মারা গেল।

পরদিন সকালের খবরের কাগজে বড় খবর। বিগত ৪৮ ঘণ্টায় বেলেঘাটা শিশু হাসপাতালে ২৮ জন শিশু মারা গিয়েছে। হাসপাতালের অধ্যক্ষ বিবৃতি দিয়েছেন, প্রায় সমস্ত বাচ্চাই বহু দূর দূরান্ত থেকে রেফার হয়ে এসেছে এবং প্রায় শেষ অবস্থায়। তার ওপর এত রোগীর চাপ।

ছবিও বেরিয়েছে। বাচ্চার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদছেন মায়েরা। নমিতার ছবিও আছে। কোলে বাচ্চাকে শুইয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। চোখে জল নেই।

উমা

অঙ্কের বাস্তবতা আর বাস্তবের অঙ্ক

ভূপতি চক্রবর্তী

বিষয় হিসেবে অঙ্ক কারো পছন্দ আর কেউবা তাকে দেখতেই পারেন না। কেউ অঙ্ককে জীবনের ধ্যান জ্ঞান করে নিয়েছেন, কেউ থাকতে চান তার থেকে শত হস্ত দূরে। তবু স্কুলের একেবারে গোড়ার দিকে যে অঙ্ক আমাদের সকলকেই শিখতে হয়, যে অঙ্কের সদা সর্বদা প্রয়োগ রয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তা হচ্ছে পাটীগণিত। দোকান-বাজার, রোজকার হিসেব-নিকেশ, লাভ-ক্ষতি, টাকাপয়সার সুদ গণনা বা মাপজোকের কাজে ওই পাটীগণিত ছাড়া চলে না। তাই পছন্দ করি বা না করি পাটীগণিত কিন্তু আমাদের খুব কাছের বিষয়।

আর সম্ভবত, সে জন্য পাটীগণিতের ভাষা বা উপস্থাপনা সময়ের সঙ্গে পাল্টে গেছে। এটা হয়ত স্বাভাবিক কিন্তু আমরা অনেক সময় ব্যাপারটা খেয়াল রাখি না, আর তাই পাটীগণিতের বইতে সামাজিক প্রতিফলন খুঁজতে যাই না। অথচ সেদিকে নজর দিলে সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসের কিছু উপাদান মিলতে পারে বলে মনে হয়। এরকম একটা চিন্তা মাথায় রেখে হাতে তুলে নিয়েছিলাম নতুন ও পুরনো কয়েকটি পাটীগণিত বই। পুরনো বই বলতে আমাদের অনেকের অতি পরিচিত আদি অকৃত্রিম যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের বিখ্যাত পাটীগণিত বইটি নিয়েছিলাম। তবে এই বইটির বাংলা সংস্করণ কিছুটা চেষ্টা করেও জোগাড় করতে অক্ষম হওয়ায় লেখার কাজে ইংরাজিতে লেখা বইটি ব্যবহার করেছি। পুস্তক বিক্রেতারা জানিয়েছেন যে, যাদববাবুর বইয়ের চাহিদা থাকলেও তা এখন কেবল ইংরাজি ভার্সানের জন্য, বাংলায় লেখা বইটির তেমন চাহিদা না থাকায় তা এখন সহজলভ্য নয়। এটিও কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়। আর ছিল পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রকাশিত অষ্টম ও দশম শ্রেণীর অঙ্ক বই যার খানিকটা অংশ হচ্ছে পাটীগণিত। বলা দরকার, গণিতের যে দুটি বাংলা বই এই লেখার জন্য ব্যবহার করেছি সে দুটির প্রকাশক (২০১৩ ও ২০১৪ সালে)— যথাক্রমে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং মধ্য শিক্ষা পর্ষদ। জানা নেই দুটি বই প্রকাশনার মাঝের সময়ে পর্ষদের নামের এই পরিবর্তন হয়েছে কিনা।

দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বইতে (১০ম শ্রেণী) মিশ্রণের অঙ্কে এখন কেউ দুধে জল মেশায় না। ওই বইয়ের অঙ্কে জলে সিরাপ মেশানো হয়, ফলের রস মেশানো হয়। এমন কি ম্যাঙ্গো স্কোয়াশও জলে মেশানোর কথা সেখানকার অঙ্কে বলা হয়। কিন্তু দুধে জল? নৈব নৈব চ। অথচ যাদববাবুর পাটীগণিতে (বইটিকে এরপর থেকে যা চ-র বই বলে উল্লেখ করব) মিশ্রণের অঙ্কে দুধে জল মেশানোর ঘটনা প্রায়শই দেখা যাচ্ছে। যা চ-র বইতে (পৃ ২৮৬) দেখা যাচ্ছে একজন ব্যক্তি দুধে জল মেশাচ্ছেন এবং তাঁকে অসৎ ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে (৩২ নম্বর প্রশ্ন)। মনে হয় এটা অনেক বাস্তবসম্মত অঙ্ক। দুধে জল মেশানোর ঘটনার সঙ্গে আরও কিছু বিষয় যুক্ত। বাংলাভাষীদের মধ্যে দুধজাত খাবার যেমন ছানার মিষ্টি, দৈ, বর্তমানে পনির যথেষ্ট জনপ্রিয় হলেও সরাসরি দুধ পান যাঁরা করেন, তাঁদের অধিকাংশই শিশু বা বয়স্ক মানুষ কিংবা অসুস্থ রোগী। সুস্থ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে দুধ পানের চল বেশ কম। তাই দুধে জল মেশানোর অর্থ হচ্ছে শিশু, বয়স্ক কিংবা অসুস্থ মানুষের প্রয়োজনীয় পানীয়ে ভেজাল মেশানো। বিষয়টি নিঃসন্দেহে কিছুটা সংবেদনশীল। মিষ্টিতে বা দৈ-তে কি ভেজাল মেশানো হল তা নিয়ে মাথাব্যথা তুলনায় কম, সেগুলি স্বাদে ভাল আর টাটকা হলেই ক্রেতা খুশি।

যদি ধরে নেওয়া হয় যে অঙ্ক হবে বাস্তবসম্মত তাহলে দেশের স্বাধীনতার সময়ে, অর্থাৎ আজ থেকে ৬০-৬৫ বছর আগে দুধে জল মেশানো ছিল খুব চেনা ঘটনা আর এখন তা হয়ে গেছে একেবারে বিরল! অথবা দুধে জল মেশানোর মতো অনৈতিক কাজ শিশুমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে এই আশঙ্কায় বিষয়টি অঙ্কের প্রশ্নে ঢোকানো হয় নি। কিংবা দুধে জল মেশানোর কথা বললে দুগ্ধ বিক্রেতাকে খাটো করা হয়,

একটু শক্ত ভাষায় বললে তিনি চিহ্নিত হন প্রতারক হিসেবে এবং তা অবশ্যই এক সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত বলে এখন অনেকে মনে করেন। এরকম একটা ধারণা হয়ত সেই সময় ছিল যে দুধ বিক্রেতা পরিবারের সন্তান উঁচু ক্লাসের পাটীগণিত পর্যন্ত পৌঁছবে না অতএব জানতেও পারবে না তাদের পেশাকে রীতিমতো অসম্মান করে উচ্চবর্ণের বাড়ির সন্তানেরা কীরকম অঙ্ক শিখে চলেছে। আবার এই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বইতে আসাম চায়ের সঙ্গে দার্জিলিঙ চা মিশিয়ে বিক্রি করার একাধিক অঙ্ক ও উদাহরণ রয়েছে। এই মেশানোকে বলা হয় ব্লেন্ডিং, অতএব এটি ভেজাল নয়। হাজার হোক চায়ের সঙ্গে চা মিশছে, হলই বা দু'রকমের চা। সেখানে দুধে জল মেশানো অবশ্যই দুটি ভিন্ন ধরনের তরলের মিশ্রণ।

একটা ধারণা হয়ত সেই সময় ছিল যে দুধ বিক্রেতা পরিবারের সন্তান উঁচু ক্লাসের পাটীগণিত পর্যন্ত পৌঁছবে না অতএব জানতেও পারবে না তাদের পেশাকে রীতিমতো অসম্মান করে উচ্চবর্ণের বাড়ির সন্তানেরা কীরকম অঙ্ক শিখে চলেছে।

যা চ-র বইয়ের যে সংস্করণ নিয়ে এই লেখার কাজ করেছি, সেটির প্রকাশনার বছর ২০০১, তবে তা তুলনায় আধুনিক, কারণ সেখানে এস আই এককের বহু অঙ্ক রয়েছে। কিন্তু বইয়ের মূল ছাঁচটি পুরনো বইয়ের আদলেই রাখা আছে যার বহু পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। যা চ-র বইতে মিশ্রণের অঙ্কে দেখা যাচ্ছে জলে ওয়াইন বা মদের মিশ্রণের কথাও (পৃ ৫২৭)। তিনি উল্লেখ করেছেন এটা হয়ত বা সাহেবি প্রভাবের ফল। আর দুধে জলের কথা তো রয়েইছে। ফিনাইল বা ফলের রস সেখানে মিলবে না।

যা চ-র বইতে সময় ও দূরত্বের কিছু অঙ্ক দেখলে এখনকার ছাত্ররা তো বটেই এমনকি তাদের অভিভাবকরাও কিছুটা ভয় পেয়ে যাবেন। সেখানে একজন ব্যক্তি পায়ে হেঁটে কলকাতা থেকে শ্রীরামপুর (বন্ধনীতে দেওয়া আছে যে ওই দূরত্ব ২৪ কিমি) যাত্রা করছেন। আর একটি অঙ্কে (পৃ ৩৫৮) একজন পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন কানপুর থেকে এলাহাবাদ। এখানে দূরত্ব উল্লেখ করা হয় নি। ওই দূরত্ব আদতে ১৯৮ কি মি। যাঁরা সেটা খেয়াল করবেন তাঁদের অস্বস্তি হতে পারে, তবে প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে অনেক মানুষ এখনকার তুলনায় বেশি হাঁটলেও প্রায় ২০০ কিমি নিশ্চয়ই হেঁটে যেতে হত না।

যা চ-র বইতে ঐকিক নিয়মের অঙ্কে দিব্যি রয়েছে এমন সব প্রশ্ন যা আজকের দিনে 'পলিটিক্যালি কারেক্ট' নয়। না, সেগুলি বিশেষ ভুল বলা যাবে না। কিন্তু এখন তা বলা যায় না অন্তত সরকারিভাবে তো নয়ই। তাই যা চ-তে দেখতে পাচ্ছি শিশুশ্রমের নিষেধের কথা মাথায় না রেখে বলা হচ্ছে ৪ জন পুরুষ ৬ জন বালকের সমান কাজ করে (পৃ ১৭৭)। পুরুষ ও নারীর সমানাধিকারের কথা মাথায় রাখতে হয় না বলে যা চ-র বইয়ের অঙ্কে পাওয়া যায় ৪ জন পুরুষের মজুরি ৫ জন মহিলার মজুরির সমান (পৃ ১৭৮)। যা চ-র বইতে ৫৪০ পৃষ্ঠায় বিবিধ প্রশ্নমালায় একটি অঙ্কে দেখা যাচ্ছে যে ৩ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলা সম্মিলিভাবে একটি কাজ করে ৮ দিনে এবং ওই একই কাজ ২ জন পুরুষ ও ৬ জন শিশু ১২ দিনে করতে পারে। আরও কিছু তথ্য সরবরাহ করে জানতে চাওয়া হয়েছে পুরুষ, নারী ও শিশুর তুলনামূলক ক্ষমতা বা কাজ করার সক্ষমতা কত হবে। এ যেন একেবারে অঙ্ক কষে পুরুষ, নারী ও শিশুর কাজ করার কেবল ক্ষমতা নয় তাদের মজুরি নির্ধারণের চেষ্টা। প্রসঙ্গত একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা কিন্তু এখন জানি যে, বেশ অনেক ধরনের কাজ রয়েছে যেখানে মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় বেশি দক্ষ এবং মহিলাদের সেই কাজের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি বেতনও দেওয়া হয়। কিংবা এখনকার ১০০ দিনের কাজে মহিলা পুরুষের জন্য প্রাপ্য অর্থের কোনো পার্থক্য নেই। যা চ-কে দোষ দেওয়া হয়ত ঠিক হবে না কারণ এটা মানতে হবে যে কেবল আজ থেকে ৬০-৭০ বছর আগে একই কাজের জন্য নারী ও পুরুষের কেবল ভিন্ন ভিন্ন বেতন বা মজুরি ছিল। আমাদের মানসিকতায় তা এতটাই গেঁথে রয়েছে যে অঙ্কের বইতে এমন একটা বিষয়ের উপস্থিতি বিশেষ

ভ্রূকুঞ্চনের সৃষ্টি করে না।

আবার ঐকিক নিয়মের অঙ্কে দেখা যায় এক ভৃত্যের (সারভ্যান্ট) বার্ষিক বেতনের কথা। যেহেতু সংশিষ্ট ব্যক্তিটিকে ভৃত্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে তার বেতন তুলনায় খুবই কম। আবার তা পরের অঙ্কটিতেই তুলনায় অনেক বেশি বার্ষিক বেতনের কথা যেখানে বলা হয়েছে সেখানে ওই রোজগেরে ব্যক্তিটির পরিচয় ভৃত্য নয়, তিনি একজন ব্যক্তি (ম্যান) (পৃ ১৭৬)। এখনকার বইতে মেলে মাসিক জমা প্রকল্পে টাকা জমা রাখা এবং তার সুদ বিষয়ক অঙ্ক। কাজ বলতে এখনকার বইতে কেবল মাঠের ফসল তোলার কাজের কথা থাকে না, থাকে গ্রামের রাস্তা বাঁধানোর কাজ, পুকুর কাটা বা তাঁতে শাড়ি বোনার কাজ। অঙ্কেই খবর মেলে কৃষকদের সমবায় সমিতির, অঙ্কেই খবর মেলে কৃষি খামারের। গ্রামীণ অর্থনীতির এই পরিবর্তন অবশ্যই এখনকার ঘটনা। স্বাভাবিকভাবেই যা চ-র বইতে এমন অঙ্কের হদিশ মেলে না।

মনে রাখতে হবে, আমরা কিন্তু যা চ-র বইয়ের জিনিসপত্রের দাম বা কাজের মজুরির দিকে নজর দিচ্ছি না কারণ বেশ কিছুটা পুরনো সংস্করণের বইতে সেই সময়কার দরদাম বা বেতন অনুযায়ী সংখ্যাগুলি হবে এটাই স্বাভাবিক। বস্তুত ষাটের দশকের এমনকি কিছু সত্তরের দশকের হিন্দি বা বাংলা সিনেমা দেখলে লক্ষ্য করা যাবে, সেখানে যে পরিমাণ টাকা দিলে বাড়ি, গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে বা মুক্তিপণ হিসেবে যথেষ্ট ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে যে পরিমাণ অর্থ দাবি করা হচ্ছে, তা এখনকার বিচারে নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। আমরা তাই যা চ-র ওই বইতে থাকা কিছু পুরনো বা তৎকালীন প্রচলিত কিছু মাপজোকের এককের দিকেও দৃষ্টি দিচ্ছি না, কারণ সেগুলি সেই সময়কার প্রচলিত ব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল।

সামাজিক বৈষম্য কি এখন সব দূর হয়ে গেছে? নিশ্চয়ই নয়। আমরা অবশ্য সচেতনভাবে প্রয়াস দিচ্ছি যেন নতুন প্রজন্মের এই বৈষম্যের মানসিকতা থেকে উত্তরণ ঘটে। তাই পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বইতে এর পরিচয় মেলে। হয়ত বা ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাপারটা আরোপিত মনে হয়, কৃত্রিম লাগে। তবু এর প্রয়োজনীয়তা কেউই সম্ভবত অস্বীকার করবেন না। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে তা যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা যথেষ্ট বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের বয়সের কথা মাথায় রাখলে মনে হবে অঙ্কের নাম করে এ যেন এক সমাজশিক্ষার এবং সরকারি উদ্যোগের এক ব্যাপক প্রচার। তাই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বই আরও অনেক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে, সেটি আর নিছকই অঙ্কের বই নয়। সেখানে খবর মেলে যে কোনো রাজ্যে (সে কি আমাদের রাজ্য?) পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রচারাভিযানের মাধ্যমে পথ দুর্ঘটনা প্রতি বছর তার পূর্ব বছরের তুলনায় ১০ হ্রাস পেয়েছে। খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা সন্দেহ নেই। ভাবুন তো রাস্তাঘাট মেরামতি করতে হল না, লাইসেন্স ছাড়া যাঁরা গাড়ি চালাচ্ছে তাঁদের ধরপাকড় করতে হল না, লরি বা ট্রাকে অতিরিক্ত মাল পরিবহণে বিধিনিষেধ আরোপ করতে হল না, ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যা বাড়াতে হল না, এরকম অনেক কিছু না করেও পথ দুর্ঘটনা হ্রাস পেয়ে গেল কেবল প্রচারাভিযানের জোরে। এই হ্রাসের মাত্রা এতটাই উল্লেখযোগ্য যে মাত্র কয়েক বছর এটা চালিয়ে গেলে ওই রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা বলে আর কিছু থাকবে না। প্রচারাভিযান যে কার বোঝা শক্ত! (দশম শ্রেণী, পৃ ৬২)।

পরবর্তী আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রকাশিত ক্লাস টেনের বইটির প্রকাশনার দিকে একটু নজর দেব। এই বইটি বাজারে পাওয়া যায় অর্থাৎ দোকান থেকে ছাপানো দাম (৯১ টাকা) দিয়ে কেনা যায়। এবং স্কুল থেকে তা সংগ্রহ করা আবশ্যিক নয়। এই বই হাতে তুলে দেখা গেল যে গোড়াতে লেখা রয়েছে 'নতুন পাঠ্যসূচী অনুসারে' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে। মাঝে একবার পুনর্মুদ্রণের পরে প্রকাশিত হয় 'পুনর্বিন্যস্ত দ্বিতীয় সংস্করণ' ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে। এরপর বইটি ৩ বার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এবং তা শেষবার হয়েছে ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে, আর আমার হাতে এসেছে এই শেষ মুদ্রণের একটি বই। এই প্রেক্ষাপট জানা থাকলে হয়ত বইটির অঙ্কের ভাষা বুঝতে সুবিধা হবে। সেখানে অঙ্কের প্রশ্নে অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর পাওয়া যাচ্ছে, যে খবর কেবল ছাত্রছাত্রীকে নয় সমৃদ্ধ করবে তাদের অভিভাবকদেরও। দশম শ্রেণীর বইয়ের শতকরা হিসেবের অঙ্কগুলি এ ব্যাপারে বিশেষ এগিয়ে আছে। আমরা ওই প্রশ্নমালার ৪ নম্বর অঙ্কে (পৃ ৬১) জানতে পারছি যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে শিশুমৃত্যুর হার তার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৫ হ্রাস পেয়েছে। আমাদের দেশে বিশেষত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর জনগোষ্ঠীর মধ্যে তুলনায় এই বেদনাদায়ক ঘটনার হার বেশি এবং শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনা যে কোনো সরকারের জন্য একটা খুব বড় চ্যালেঞ্জ। এর জন্য প্রয়োজন অনেকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যার একটি অবশ্যই 'স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি'। কিন্তু এই দাবি কি কেউ করতে পারেন যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর কোনো উন্নতি

না করে অর্থাৎ উপযুক্ত সংখ্যক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের, চিকিৎসকের, চিকিৎসা কর্মীর বা ওষুধপত্রের ব্যবস্থা না করে কেবলমাত্র সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচার করে লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে? নাকি যায়?

ওখানেই ঠিক তার পরের প্রশ্নে জানা যাচ্ছে 'সর্বশিক্ষা অভিযানের ফলে বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাওয়া শিক্ষার্থীদের পুনরায় বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি বছর তার পূর্ববর্তী বছর অপেক্ষা এরূপ শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।' এরপর শুরু হয়েছে অঙ্কের বাকি অংশ। পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রচারাভিযানের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে (৬ নম্বর প্রশ্ন)। ৮ নম্বর প্রশ্নে শোনা যাচ্ছে পানীয় জলের অপচয় রোধ সংক্রান্ত প্রচারাভিযানের ফল হিসেবে শহরের জলের অপচয় হ্রাসের কাহিনী। এছাড়া এই একটি মাত্র প্রশ্নমালার মাত্র ১৮টি অঙ্কের প্রশ্ন পাঠ করতে করতে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা জেনে যাবে মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের কথা, যা অন্য স্কুলের থেকে কিছুটা আলাদা, পঞ্চায়েত সমিতির গণমুখী কাজের কথা, কৃষি জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের 'কুফল'। এছাড়া জানা যাবে, টানা রিকশা তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীরই একটি রূপ, বোতলভর্তি ঠাণ্ডা পানীয়ের সেবনকারীরা কীভাবে সেই পানীয়ের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হচ্ছে, অবশ্যই প্রচারাভিযানের ফলে, এরকম অনেক কিছু।

কিন্তু যা চ-র বইতে পুরনো সময়ের বাস্তব চিত্র মেলে, এবং তা মোটেই আজকের মতো 'পলিটিক্যালি কারেক্ট' নয়। যেমন এই বইয়ের ৫২১ পৃষ্ঠার একটি অঙ্কে (১৪) দেখতে পাচ্ছি তিনজন লোক একটি কাজের জন্য নিয়োজিত হয়েছেন এবং তারা দৈনিক যথাক্রমে ৮, ৯ ও ১০ ঘণ্টা কাজ করছেন। অথচ তাদের দৈনিক মজুরি সমান। এমনটা হয়ত আজও হতে পারে তবে সে ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই উল্লেখ থাকবে যে তাদের কাজের প্রকৃতি আলাদা। একই কাজ করিয়ে ভিন্ন মজুরি দেওয়ার কথা অন্তত অফিসিয়ালি বলা যাবে না। তবে এই অঙ্কে আরও খানিকটা লক্ষণীয় বিষয় আছে। প্রথমত, এখানে দৈনিক কাজের সময় বলা হয়েছে ১০ ঘণ্টা এবং এই অঙ্কটি পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে ওই কর্মীরা এরপর তাদের দৈনিক কাজের সময়সীমা আরও ১ ঘণ্টা বৃদ্ধি করল, অর্থাৎ একজন দৈনিক ১১ ঘণ্টা করে কাজ করলেন। খুব বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া এরকম কাজের সময় বা ওয়ার্কিং আওয়ার্স কিন্তু দেখা যায় না।

যা চ-র বইয়ে একটি এমন বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যাকে সম্ভবত আজ থেকে ৭০-৮০ বছর আগেকার সমাজের একটা বড় প্রতিফলন হিসেবে দেখা যেতে পারে। যা চ-র বইয়ের মানুষেরা হয় পুরুষ অথবা মহিলা কিংবা শিশু। তাদের কোনো নাম নেই, নেই তাদের সামাজিক অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় পরিচয়। তারা কেবলই কর্মী। এখনকার বইতে দেখা যায় এর উল্টো উপস্থাপনা। সেখানে পাওয়া যায় বহু নাম, যার মধ্যে ছেলে, মেয়ে উভয়ই রয়েছে। এবং এই নামগুলিতে মাধুর্য এবং বৈচিত্র্য পাওয়া যাচ্ছে, রয়েছে নগরায়নের প্রভাব, রয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া। সেখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে নানা ধর্মের মানুষের নাম। আর তাই মনে হয় এই পদক্ষেপ অঙ্কের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্ক নিবিড় করতে সাহায্য করছে। এখনকার অঙ্কে বিজনবাবু ফিনাইল আর জল মেশান, আমিনাবিবি বালি সিমেন্ট মিশিয়ে গাঁথনির মশলা তৈরি করেন (করে নয়), রেশমি খাতুন গ্লাসে সরবৎ পূর্ণ করছে (বুঝে নিতে হবে রেশমি খাতুন বয়সে ছোট, সম্ভবত এক ছাত্রী)। অঙ্কে পাওয়া যাচ্ছে কিছুটা চেনা চরিত্র সুভাষকাকা আর ভেঙ্কটমামাদের যা হয়ত ছাত্রছাত্রীকে অঙ্কের কাছাকাছি আসতে সাহায্য করবে।

পাটীগণিত জীবনমুখী। তাই বিলিতি পাটীগণিতের বইয়ের প্রশ্ন তৈরি হয় সে দেশের জীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। সেখানকার প্রশ্নে যে সব চরিত্ররা আসে তাদের নাম হয় সেখানকার মানুষজনের নাম অনুযায়ী, ক্ষেতে সেখানে চাষ করে ঘোড়া আর ট্রাক্টর। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে জ্যামিতি বা বীজগণিত কিন্তু একেবারে নৈর্ব্যক্তিক, মানুষ বা সময়ের ধাক্কা তাদের গায়ে লাগে না। কিছু বীজগণিতের অঙ্কে অবশ্য মানুষজন ঢুকে যায়, যেমন বীজগণিতীয় সমাধানের অঙ্কে পিতা ও পুত্র বা দুটি গাড়ি বা দুখানা ট্রেন চলে আসে। পরিমিতির অঙ্কে এসে যায় চৌবাচ্চার মাপ বা ফানেলের (শঙ্কু) মাপজোক (অষ্টম শ্রেণীর বই)। তবে চৌবাচ্চা, ফানেল, চোঙ বা বেলনের মতো নামগুলি এখন তাদের ইংরাজি নামের ধাক্কায় প্রায় অপরিচিত হতে শুরু করেছে বাংলা মাধ্যমে পাঠরত ছাত্রদের কাছেও। তবু কখনও কখনও এই জীবনমুখী অঙ্ক মার খেয়ে যায় আদত জীবনের কাছে। পাটীগণিতের অঙ্কের একটা খুব বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার রৈখিক চলন। অর্থাৎ কোনো কিছু যদি একটা নিয়ম মেনে চলে তা কেবল সেই নিয়মই অনুসরণ করে যাবে, সেই ছন্দই সদাসর্বদা থেকে যাবে এবং সেই পথেই মিলবে অঙ্কের সঠিক উত্তর। বাস্তবে কিন্তু এরকম

সচরাচর ঘটে না কারণ বাস্তব জীবন খুবই নন লিনিয়ার বা অরৈখিক। তারই একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

ঐকিক নিয়মের খুব পরিচিত একটা অঙ্ক নেওয়া যাক। ৫ জন লোক দিনে ৭ ঘণ্টা করে খেটে একটা দোকানঘর ১২ দিনে বানায়। এই কাজটা ৭ জন লোক দিনে ১০ ঘণ্টা করে খেটে করলে কতদিনে তা শেষ হবে? অঙ্কটা করতে হবে না, উত্তরটা বলে দিচ্ছি। উত্তর হচ্ছে ৬ দিন। এটাই স্বাভাবিক কারণ লোক বেড়ে গেছে, দৈনিক কাজের সময় বেড়ে গেছে, সময় তো কম লাগবেই! এবার তাহলে লোকসংখ্যা আরও বাড়ানো যাক। দৈনিক কাজের ঘণ্টা আর বাড়ালাম না, কারণ তা আইনে আটকায়। এবার তাহলে দেখা যাবে যে কর্মী সংখ্যা বাড়িয়ে ৪২ করলে মাত্র ১ দিনেই কাজটা হয়ে যাবে। লোক বাড়িয়ে ৮৪ করলে এক বেলাতেই কাজ শেষ। লোক বাড়িয়ে ১২৬ করলে— দাঁড়ান দাঁড়ান, কাজটা যেন কী? একটা দোকানঘর তৈরি, না? আরে মশাই, দোকানঘর কি এক বেলাতে হয়ে যায়? নাকি আপনার পয়সা আছে বলে তা একবেলাতেই করে ফেলবেন? মাটি খুঁড়ে গাঁথনি করবেন, দেওয়াল তুলবেন, কাঁচা দেওয়াল শুকোবে, ছাদ ঢালাই হবে, কয়েকদিন তাতে জল ঢালবেন, তা শুকিয়ে শক্ত হবে, কাজ বন্ধ থাকবে ক'দিন। তারপর হবে ভেতরের কাজ, ইলেকট্রিক, জলের লাইন, টালির কাজ। দোকানঘর কি অত তাড়াতাড়ি হয়? সত্যিই তো এ যে বাস্তবের অঙ্ক যা কিনা অঙ্কের বাস্তবতা থেকে কখনও কখনও একটু ভিন্ন হয়। পাটীগণিত নিঃসন্দেহে জীবনমুখী কিন্তু জীবন যে সর্বদা গণিতের ওই রৈখিক হিসেব মেনে চলে না। যাদববাবুর বই বা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বই উভয়েই ক্ষেত্র বিশেষে কিছুটা অসহায়। হয়ত বা পরিস্থিতির শিকার। তবে এটাও কিন্তু অঙ্ককে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে।

সাহায্য সূত্র:

১। Arithmetic (for the use of schools and colleges) by Jadav Chandra Chakravarti M.A. [Revised sixty-third edition], P.C. Chakravarti & Co., 74 Bechu Chatterjee Street, Calcutta 9, 2001.

২। গণিত (দশম শ্রেণী) পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ (পুনর্মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১৪)

৩। গণিতপ্রভা (অষ্টম শ্রেণী) পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১৩।

উমা

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল

১। প্রকাশস্থান: বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪

২। প্রকাশকাল: ত্রৈমাসিক

৩। প্রকাশক ও মুদ্রক: বরুণ ভট্টাচার্য

৪। মুদ্রণস্থান: জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন। কলকাতা-৭০০ ০০৬।

৫। সম্পাদক: সমীরকুমার ঘোষ, ৫২/৫১, শশিভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলকাতা- ৭০০ ০৩৬।

আমি বরুণ ভট্টাচার্য এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১ মার্চ, ২০১৫ **বরুণ ভট্টাচার্য**
প্রকাশক

সুব্রত ভট্টাচার্য্য

1. Bourgeois Science, Political Economy & Homeopathy- a marxist approach to post-Capitalism.- Rs. 100/-

২. অ্যালোপ্যাথি বনাম হোমিওপ্যাথি
– একটি সমীক্ষা– Rs.20/-

এই প্রথম হোমিওপ্যাথির বিজ্ঞানভিত্তি লেখক প্রতিষ্ঠা করেছেন। অবশেষে অ্যালোপ্যাথি বনাম হোমিওপ্যাথির দীর্ঘদিনের বিজ্ঞান বিষয়ক বিরোধের অবসান হল। চিকিৎসাশাস্ত্রে আগ্রহী প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান– ধ্যানবিন্দু (কলেজ স্কোয়ারের পিছনে)
email - bhattacharyasubrata6@gmail.com

করোনারি অ্যানজিওগ্রাম: প্রযুক্তির অপব্যবহারের উজ্জ্বল উদাহরণ

গৌতম মিস্ত্রি

একটা শিঙাড়ার জন্যে: মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য বুকের ব্যথা নিয়ে শহরের সবচেয়ে নামকরা সরকারি হাসপাতালে ভর্তি। ভালোয়-মন্দয় মিশিয়ে গড়িয়ে, হোঁচট খেয়ে সংসারটা চলছিল। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এই উটকো ঝামেলা। কর্তাবাবু শীতের সন্ধেয় শখ করে ফুলকপির শিঙাড়া খেয়ে কয়েকবার চোঁয়া ঢেকুর তুলে রাতের খাবার ভাল করে খেতে পারেন নি। শুতে যাবার সময় একবার বমিও করলেন। রাত ২টো নাগাদ বুকে একটা চাপ অনুভব করলেন। গরম জল আর বাঙালির পেটের রোগের সর্বঘটের হরিতকী অম্বলের ওষুধ দু দফা খাওয়া হল। পাড়ার প্রবীণ ডাক্তার শুনে টেলিফোনেই নিদান দিলেন– জিভের নীচে হৃদরোগের বড়ি রাখতে। আজকাল সহজেই পাওয়া যায়, নিজের বাড়িতে না থাকলেও আশপাশের বাড়িতে পাওয়া যাবেই। মুশকিল হল, রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ব্যথাও বাড়তে লাগল। অগত্যা ট্যাক্সি খোঁজা, হাসপাতালে ছোটা।

ব্যাকুল হৃদয়ে রাতের আঁধারে হাসপাতালে অভিসার: টেলিভিশন আর সিনেমায় যেমনটি দেখা যায়, তেমনটি হচ্ছে না। সরকারি হোক বা কর্পোরেট হাসপাতাল, কোথাও কেউ 'আমার সকল নিয়ে' অ্যাকশনের ভঙ্গিতে পোজ দিয়ে বসে নেই। ঘুম থেকে তুলতে হচ্ছে নার্স আর রাতের একমাত্র ভাগ্যনিয়ন্ত্রক 'হাউস স্টাফ' বা জুনিয়ার ডাক্তারকে। অপরাধী মুখ করে নিবেদন করা হল সমস্যাটা। ভাল করে ব্যথার কথাটাও বলার সময় দিলেন না ডাক্তারবাবু। মুখ ঢেকে গেল অক্সিজেনের মুখোশে, হাতে স্যালাইনের নল। বিপ বিপ বিপ... শব্দে চলমান হৃদস্পন্দনের রেখাচিত্রের যন্ত্র গুরুগম্ভীর আবহ সৃষ্টি করে তুলল। প্রযুক্তিসর্বস্ব আধুনিক চিকিৎসায় প্রশিক্ষিত নতুন প্রজন্মের চিকিৎসকদের রোগলক্ষণ বিশ্লেষণের ক্ষমতা ব্যবহার করার সুযোগ, প্রয়োজন আর উৎসাহ কম। অব্যবহারে এই দুর্লভ গুণটির অকালমৃত্যু হয়ে যায়। পশ্চিমী ধারা অনুকরণে এখন ব্যবহারিক চিকিৎসা প্রযুক্তিতে ব্যক্তি চিকিৎসকের রোগলক্ষণ বিশ্লেষণের ক্ষমতা অবহেলিত, চিকিৎসক প্রশিক্ষিত হন যন্ত্রচালক হিসাবে, যে কাজের জন্য মেধার প্রয়োজন সামান্য। সুস্পষ্ট নির্দেশিকা আছে, রোগ নির্ণয়ের জন্য হরেক রকমের ডাক্তারি পরীক্ষাও আছে। 'ফ্লো-চার্ট' মেনে পরীক্ষার ফলের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন কেবল একটা রীতি মেনে চলায় পর্যবসিত হয়েছে। চিকিৎসকের অনুপস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নার্স আর অ্যাম্বুলেন্স কর্মীদের ওপর নিয়ম করেই দেওয়া আছে পশ্চিমী দেশগুলোতে। আমাদের দেশে এটা বিধিসম্মত না হলেও 'ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের' পর্দার আড়ালে গভীর রাতে এই সিদ্ধান্তগুলো নার্স ও অন্য চিকিৎসা কর্মীদেরই নিতে হয়। বিধিসম্মত নয় বলে, এদের প্রশিক্ষিত করাও হয় না। যদিও এই দীনতা কোনো চিকিৎসা সংস্থা স্বীকার করবে না, 'ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে' কাজের অভিজ্ঞতা আছে, এমন চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের কাছে এটা থেকে যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে।

পর্দার পেছনের কর্মকাণ্ড : নির্দেশিকার ক্রম অনুযায়ী চিকিৎসায় সিদ্ধান্তগ্রহণ চিকিৎসকের বিশ্লেষণক্ষম চিন্তা প্রক্রিয়ার পরিবর্তে পূর্বনির্ধারিত যান্ত্রিক 'ফ্লো-চার্ট' বা কর্মপদ্ধতি অনুসরণে পর্যবসিত হয়। মানবিক চিকিৎসা নয়, দামী ও পশ্চিমী দেশ থেকে আমদানি করা যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ে, কমে চিকিৎসকের দায়বদ্ধতা আর চিকিৎসিতের ভরসা। রোগী বিস্মৃত হয় তার এক মৌলিক অধিকারবোধের— কোন রোগের জন্য সে চিকিৎসিত হচ্ছে। উৎকণ্ঠার চাপে সেটা জানার তাগিদ হারিয়ে যায়। ডাক্তারবাবু রোগের টিকিটি ধরতে পারলেন কি না, সেটা আর জানা হয়ে ওঠে না। রোগী মারা গেলে সেটা জানার প্রবল আগ্রহ হয়, কিন্তু সেরে গেলেও এটা খুব দরকার। প্রশিক্ষণকালে রোগনির্ণয় ও তার প্রথাগত পঞ্জীকরণের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করা হলেও, সেই শিক্ষা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে

যায়। উৎকণ্ঠার এই চরম মুহূর্তে রোগী অথবা তার আত্মীয়স্বজনদের ব্যস্ত রাখার হরেক উপায় আছে। ট্রলি ঠেলা, ওষুধ কিনে আনা, রক্ত জোগাড় করা এই সব কাজে ব্যস্ত মানুষগুলোর স্থির মস্তিষ্কে ভাবার অবকাশ থাকে না। এদিকে রাত গড়িয়ে সকাল হয়, ক্লান্ত রোগী এক সময় ঘুমিয়েই পড়ে। হাসপাতালের সামনের ফুটপাথে রাতজাগা রোগীর বাড়ির কিছু লোক বাড়ি ফেরে, পরের শিফটের ডিউটির জন্য তৈরি হতে। এমন সময় প্রবীণ হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ রাউন্ডে এসে জানান দেন হৃদযন্ত্রে ব্লক থাকতে পারে। বিজ্ঞাপনের দৌলতে ব্লক শব্দটির সঙ্গে আমরা অপরিচিত নই। তাই করোনারি অ্যানজিওগ্রাম করার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না ডাক্তারবাবুকে।

এইখানে আমাদের কয়েকটা প্রাকৃতিক আপাত সাদৃশ্য ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে বলে ধরে নিতে হচ্ছে, যেটা বিজ্ঞানসম্মত নয়। হার্ট ব্লক বলতে এক্ষেত্রে হৃৎপেশীর ধমনীতে কোলেস্টেরল ও আনুষঙ্গিক পদার্থ জমে রক্ত চলাচলের পথটা সরু হয়ে যাওয়ার ফলে যে রোগ হয় সেটা বোঝাচ্ছে। মাঝবয়সী ভারতীয়দের মধ্যে এর প্রাদুর্ভাব বেশ বেশি। বুকের ব্যথারও হরেক রকম কারণ আছে এবং বুকের ব্যথা প্রায়শই ঘটে। এই দুই ধরনের ঘটনার সমাপতন আকছার হয়, কার্য-কারণ সম্পর্ক ছাড়াই। কিন্তু বুকের ব্যথা হলেই হার্ট ব্লককে নিশানা করে চিকিৎসা প্রক্রিয়া শুরু করাই বিপদের শুরু। বলতে পারেন, পরীক্ষাই তো, ক্ষতি কী? রোগ নেই এটা নির্ণিত হলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আর এক বৈশিষ্ট্যের কথা জেনে নিলে এমনটা আর কেউ ভাববেন না। তালগাছে কাক বসলে, তাল পড়তেই পারে। তাকে কাকতালীয় বলা যেতে পারে, কাক বসার জন্যই তাল পড়েছে এমনটা নিশ্চিন্ত করে বলা যাবে না। অ্যানজিওগ্রাম করে হৃৎপেশীর আংশিক সরু রক্তনালী নির্ণীত হতেই পারে, কিন্তু সেটাই বুকের ব্যথার কারণ মনে করলে বড় ভুল হবে। কথাটা একটু বেখাপ্পা ঠেকতে পারে। সে জন্যই চিন্তার পরিসরটা বাড়ানো প্রয়োজন। অ্যানজিওগ্রামে নির্ণীত সরু রক্তনালী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাৎক্ষণিক বুকের ব্যথার কারণ নয়।

হৃদপেশী সরু হয়ে যাওয়ায় রক্তনালীর ফলাফল তিন ধরনের হতে পারে :

(১) রক্তনালী সরু হয়ে যাওয়ার মাত্রা অল্প (৭০-৮০ শতাংশের কম : এরকম ক্ষেত্রে হৃদরোগের সূত্রপাত হয়েছে ভাবা যেতে পারে, তবে এই মাত্রার ব্লক বুকের ব্যথা সৃষ্টি করে না।[১] এ ক্ষেত্রে অ্যানজিওগ্রাফি পরীক্ষা বুকের ব্যথার চিকিৎসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে সাহায্য করে না। অ্যানজিওপ্লাস্টি বা বাইপাস অপারেশনের দ্বারা এই ব্লক নির্মূলের চেষ্টা অকাজের। এই সংক্রান্ত তথ্য বারবার জেনে, বুঝে, বিশ্বাস জন্মানোর মতো করে বুঝে নিতে হবে। সাধারণত এই অল্প মাত্রার ব্লকে হৃদরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। কঠিন পরিশ্রম করাকালীন হৃদপেশীর কাজের বোঝা বেড়ে যাবার জন্য অল্প সময় বুকে চাপ ধরার মতো এক ধরনের কষ্ট হয়। এমন ক্ষেত্রে অ্যানজিওপ্লাস্টি বা বাইপাস অপারেশন যে কোনো উপকারে আসে না, তা প্রমাণিত। অথচ এই **অল্প মাত্রার ব্লকই অ্যানজিওপ্লাস্টি প্রযুক্তির অপপ্রয়োগের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ।** অল্প মাত্রার ব্লকে অ্যানজিওপ্লাস্টি পদ্ধতি সঠিকভাবে প্রযুক্ত না হলেও, অর্থাৎ অকাজের হলেও, অ্যানজিওপ্লাস্টি প্রয়োগের অসারতা ধরা পড়ার উপায় নেই। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বুকের ব্যথা যে কারণগুলোতে হয়, সেগুলো (হাড় ও বুকের খাঁচার মাংসপেশীর ব্যথা, মানসিক উদ্বেজনিত ব্যথা ইত্যাদি) সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এমনিতেই সেরে যায়।[২] এই জন্য এই ধরনের রোগীরা অ্যানজিওপ্লাস্টি হৃদরোগ বিশারদদের কাছে বড়ই প্রিয়। অ্যানজিওপ্লাস্টি প্রক্রিয়ায় প্রথমে হৃদপেশীতে সরবরাহকারী সরু হয়ে যাওয়া রক্তনালীর অংশে একটি রক্তনালীর চেয়ে সরু নল (ক্যাথিটার) ঢুকিয়ে বাইরে থেকে উচ্চ চাপযুক্ত হাওয়া দিয়ে নলের মাথায় থাকা একটা বেলুন ফুলিয়ে রক্তনালীর সরু অংশটি মোটা করা হয়। এর পরে 'স্টেন্ট' নামে এক ধরনের খাঁচা ঐ মোটা করে দেওয়া রক্তনালীর অংশটিতে প্রতিস্থাপন করা হয়, যাতে মোটা করে দেওয়া অংশটি আবার সরু হয়ে না যায়। একটা জিনিস বেশ বোঝা যাচ্ছে, শুধু চাপ দিয়ে ব্লক সৃষ্টিকারী পদার্থগুলো সাময়িকভাবে সরিয়ে রক্তনালী মোটা করে রাখা সম্ভব, স্থিতিস্থাপকতার জন্য ব্লক পুনরায় সৃষ্টি হওয়াটা কেবল সময়ের অপেক্ষা। একটা সমস্যা মেটাতে একটা সমাধান আমদানি করা হয় বটে, কিন্তু সেই সমাধানও আবার নতুন একটা সমস্যা হিসাবে তৈরি হয়ে যায়। অপ্রয়োজনে অ্যানজিওপ্লাস্টি করার জন্য হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে, হার্টের রক্তনালীতে আগের থেকে বেশি মাত্রার ব্লক তৈরি হয়ে যায়। একটা প্রচ্ছন্ন ভুল চিকিৎসার মাসুল হিসাবে ২০-৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে কেবল একবারই নয়, বারবার কিছুদিন পর পর সঠিক প্রয়োজনে অ্যানজিওপ্লাস্টি করার দরকার হয়ে পড়ে।[৩]

(২) রক্তনালী সরু হয়ে যাওয়ার মাত্রা বেশি (৭০-৮০

শতাংশের চেয়ে বেশি) কিন্তু সেটা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায় নি।[১] এরকম ক্ষেত্রে স্বল্প শারীরিক পরিশ্রম করলে যখন হৃদপিণ্ডের ওপর কাজের চাপ বাড়ে, তখন সেই অতিরিক্ত কাজের বোঝার জন্য হৃদপেশির অধিক পরিমাণে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তের প্রয়োজন হয়। এই অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হওয়ার প্রয়োজনে সরু হয়ে যাওয়া রক্তনালী একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পরিশ্রম করার সময়, এমন ক্ষেত্রে, অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তের অভাবে হৃৎপেশীতে ব্যথার উদ্রেক হয়। যদি এটাই রোগীর রোগের আত্মপ্রকাশের লক্ষণ হয় তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওষুধপত্রের মাধ্যমে রোগীর ব্যথার উপশম ও রোগের তীব্রতার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এমন ক্ষেত্রে তড়িঘড়ি করে অ্যানজিওগ্রাম ও অ্যানজিওপ্লাস্টি করে অতিরিক্ত সুবিধা করা যায় না। উপযুক্ত ওষুধ ও স্বাস্থ্যকর জীবনশৈলী প্রয়োগ করে বিফল হলে তবেই অ্যানজিওগ্রাম ও তার পরে অবস্থা অনুযায়ী অ্যানজিওপ্লাস্টি অথবা বাইপাস অপারেশন করে রোগকষ্টের নিবারণ করার কথা ভাবা যেতে পারে।[৩]

(৩) রক্তনালী সরু হয়ে যাওয়ার মাত্রার ওপর নয়, বরং রক্তনালী সরু করার পদার্থের ভৌত অবস্থার ওপর নির্ভরশীল কারণে কখনও কখনও হৃৎপেশীর রক্তনালী ক্ষণিকের জন্য সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থাকে হার্ট অ্যাটাক বা 'হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া' বলা হয়। কেবল রক্তনালী সরু হয়ে যাওয়ার মাত্রার ওপর হার্ট অ্যাটাক নির্ভরশীল নয়। রক্তনালী সরু হওয়ার কারণ হিসাবে রক্তনালীর মধ্যে জমে ওঠা কোলেস্টেরল ও আনুষঙ্গিক পদার্থের (প্লাক) ভৌত অবস্থা এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। নরম, রাসায়নিকভাবে অধিক সক্রিয় ও স্থিতিশীল নয় এমন প্লাক বিভিন্ন তাৎক্ষণিক কারণে স্থিতিশীলতা হারায় ও ফেটে যায়। এটাই বোমার সলতেতে আগুন লাগানোর সমতুল। এই রকমের কু-সময়ে একের পর এক অনিয়ন্ত্রণযোগ্য জৈবিক ক্রিয়ার ফলে আংশিক বন্ধ হয়ে যাওয়া রক্তনালীর ওপরে রক্ত জমাট বেঁধে রক্তনালীকে পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দেয়। এর ফলে ঐ রক্তনালীর ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হৃৎপেশীতে রক্ত সরবরাহ পুরোপুরিভাবে স্তব্ধ হয়ে যায় ও হৃৎপেশীর মৃত্যু হয়।[৪] এই অবস্থা নির্ণয়ের জন্য একাধিক নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা আছে— ই সি জি আর রক্তের 'ট্রোপোনিন টি' অথবা অপেক্ষাকৃত সস্তার 'ক্রিয়েটিনিন ফসফোকাইনেজ'। অর্থাৎ বুকের ব্যথা মারাত্মক কিনা সেটা নির্ণয়ের জন্য রোগলক্ষণ সন্দেহজনক হলে উল্লিখিত পরীক্ষাগুলো যত শীঘ্র সম্ভব করে নিতে হবে। হার্ট অ্যাটাক নির্ণীত হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অস্থিতিশীল প্লাকের ওপরে জমে যাওয়া জমাট বাঁধা রক্তকে অ্যানজিওপ্লাস্টি অথবা ওষুধের মাধ্যমে সাফ করে ফেলতে হবে। প্রয়োজনে অ্যানজিওগ্রাফি করে সঙ্কটজনকভাবে সরু হয়ে যাওয়া রক্তনালীর অস্তিত্ব, অবস্থান ও জটিলতা নির্ণয় করে তৎক্ষণাৎ অ্যানজিওপ্লাস্টি করে ব্লক নির্মূল করে স্টেন্ট প্রতিস্থাপন করতে হবে। তবে করতে হবে তাড়াতাড়ি, ২ ঘণ্টার মধ্যে; নইলে কোনো লাভ নেই। জরুরি ভিত্তিতে এই পরিষেবা পাওয়া আমাদের দেশে দুর্লভ। যদি এটা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকে, তবে পরবর্তী শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা হল ওষুধের (স্ট্রেপ্টোকাইনেজ ইনজেকশন) দ্বারা জমাট বাঁধা রক্ত গলিয়ে দেওয়ার চিকিৎসা বা 'থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি'। রোগীর ভৌগোলিক অবস্থিতি, সজ্ঞান ইচ্ছা ও আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হয়। পরিসংখ্যান বলছে, বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালের আপৎকালীন (ইমার্জেন্সি) বিভাগের দ্বারস্থ রুগীদের মধ্যে এই ধরনের রুগীর সংখ্যা শতকরা ১.৫ শতাংশ।[২] একটা নির্ধারিত সময়ে (বুকে ব্যথা শুরু হওয়ার ২ ঘণ্টার মধ্যে) অ্যানজিওপ্লাস্টি করার সুবিধা আছে এমন হাসপাতালে যত শীঘ্র সম্ভব অ্যানজিওগ্রাম করে অ্যানজিওপ্লাস্টি করতে পারল রোগীকে সর্বোত্তম চিকিৎসা দেওয়া গেল বলে মনে করা হয়। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে রাখতে হবে, যেটা সাধারণ মানুষের মাথায় চট করে আসবে না, অ্যানজিওগ্রাম এখানে রোগনির্ণয় করার জন্য ব্যবহৃত হয় না, অ্যানজিওপ্লাস্টি করার একটা পর্ব হিসাবে, অ্যানজিওপ্লাস্টি করার আগে করে নিতে হয়। রোগের অস্তিত্ব অন্য প্রক্রিয়ায় জেনে নিতে ও নিশ্চিত হতে হয়।

একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে রাখতে হবে, যেটা সাধারণ মানুষের মাথায় চট করে আসবে না, অ্যানজিওগ্রাম এখানে রোগনির্ণয় করার জন্য ব্যবহৃত হয় না, অ্যানজিওপ্লাস্টি করার একটা পর্ব হিসাবে, অ্যানজিওপ্লাস্টি করার আগে করে নিতে হয়।

বিদেশের পরিসংখ্যান বলছে, বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালের আপৎকালীন পরিষেবার দ্বারস্থ হওয়া রোগীদের ৮০ শতাংশের বুকে ব্যথার কারণ কোনো শারীরিক রোগের (হৃদরোগ, ফুসফুসের রোগ বা অম্বলের রোগজনিত) জন্য

নয়। ২০ শতাংশ ক্ষেত্রে হৃদরোগজনিত কারণে বুকে ব্যথা হয়। এর মধ্যে স্থিতিশীল ইস্কিমিয়াই (ক্রনিক স্টেবল অ্যানজাইনা) বেশি। সত্যিকারের প্রাণের আশঙ্কা আছে এমন হৃদরোগ (acute coronary syndrome, unstable angina, acute myocardial infarction) মাত্র ১.৫ শতাংশের মধ্যে দেখা যায়।[২] অর্থাৎ বিধিসম্মতভাবে, চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করলে অধিকাংশ বুকের ব্যথার প্রশমন করার জন্য হৃদরোগের চিকিৎসা প্রয়োগের দরকার নেই। কর্পোরেট হাসপাতালের মুনাফার চাপ আর যন্ত্রনির্ভর চিকিৎসার সাঁড়াশি আক্রমণে ঐ ৬০- ৮০ শতাংশ বুকের ব্যথার রোগী, যাদের হৃদয় স্বাভাবিক, নির্ণয় করতে করোনারি অ্যানজিওগ্রাম করার দরকার নেই, তারা রেহাই পায় না। কেবল বুকের ব্যথার বৈশিষ্ট্য, তার হৃদরোগ হওয়ার ঝুঁকি ও প্রাথমিক পরীক্ষার (ইসিজি ও রক্ত পরীক্ষা) দ্বারা ৮০ শতাংশ নিশ্চয়তা নিয়ে হৃদরোগের সম্ভাবনা নির্মূল করা যায়।[৫-৮] অত্যাধুনিক যন্ত্রে সজ্জিত আধুনিক কর্পোরেট চিকিৎসা পরিষেবার ধ্বজাধারীরা বলবেন, হোক না বিরল, ঐ অ্যানজিওগ্রাম পরীক্ষার দ্বারা সরু রক্তনালী আছে কি না, সেটা নিশ্চিত করে নিলে ক্ষতি কী? ক্ষতি প্রচুর। আর্থিক ক্ষতি, পরিষেবা অপব্যবহারের ক্ষতি, পরীক্ষার ঝুঁকিজনিত ক্ষতি আর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হৃৎপেশীর রক্তনালীতে ব্লক ধরা পড়লে। কারণ, তখন বুকের ব্যথায় আক্রান্ত ব্যক্তির অজ্ঞতার ও উৎকণ্ঠার সুযোগের অসৎ ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই রকম সময়ে অ্যানজিওপ্লাস্টি বা বাইপাস অপারেশন চিকিৎসা বিক্রি করতে কু চিকিৎসার সওদাগরদের বেগ পেতে হয় না।

একটা ছোট জটিল বিষয় অন্তত একবার বুঝে নিতে হবে। কোনোরকম রোগ-লক্ষণ ছাড়াই হৃৎপেশীর রক্তনালীতে স্বল্পবিস্তর কোলেস্টেরল সমৃদ্ধ এথেরোস্কেরোটিক 'প্লাক' জমে রক্তনালীকে আংশিকভাবে সরু করে দিতে পারে। যদিও এটাকে রোগবিহীন অবস্থা বলা যাবে না, রোগের এই অবস্থায় এখনও পর্যন্ত উপলব্ধ নবতম প্রযুক্তির দ্বারা 'প্লাক'টিকে বেলুন দিয়ে ফুলিয়ে চেপেচুপে আর স্টেন্ট-এর খাঁচা দিয়ে ঠেকা দিয়ে রক্তনালীকে কিছুটা (কারণ সম্পূর্ণভাবে আগের মতো করে সম্ভব নয়) মোটা করে দিলে রোগের সার্বিক নিরাময় হবে না। বরং কেবল এই খোঁচাখুঁচির ফলে পরবর্তীকালে আরও প্লাক জমে রক্তনালীর সরু হয়ে যাওয়াটা ত্বরান্বিত করে দিতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুকের ব্যথার কারণ ঐ অল্পমাত্রার সরু রক্তনালী নয়। অপরদিকে অসঙ্গত কারণে অ্যানজিওপ্লাস্টি করার ফলে একটি সুপ্ত (সাবক্লিনিক্যাল) রোগকে খুঁচিয়ে রোগের অগ্রগতিকে বাড়িয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। এই কুচিকিৎসার একটা সুবিধা (চিকিৎসকের কাছে), অ্যানজিওপ্লাস্টি অসফল হলেও ছলচাতুরিটা ধরা পড়ে না। কারণ, এইসব ক্ষেত্রে বুকের ব্যথার কারণ সরু হৃৎপেশীর রক্তনালী নয়।

ওপরের অবস্থাটা তবুও সহজবোধ্য। কিন্তু কোনো কোনো সময় সরু হৃৎপেশীর রক্তনালীই বুকের ব্যথার কারণ। এইরকম অবস্থাটা আবার তিন ধরনের হতে পারে। (ক) অস্থিতিশীল অথেরোস্কেরোটিক 'প্লাক' ফেটে গিয়ে জমাট বাঁধা রক্তের পিণ্ড আংশিকভাবে সরু রক্তনালীকে পুরোপুরিভাবে রক্তনালীকে বন্ধ করে দিয়েছে।[৯] এই ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বলা হয়। এক্ষেত্রে সর্বোত্তম চিকিৎসা হল ওষুধের সঙ্গে সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অ্যানজিওগ্রাম করে অ্যানজিওপ্লাস্টি ও স্টেন্ট প্রতিস্থাপন করা। বুকের ব্যথা শুরু হবার দু ঘণ্টার মধ্যে এটা করার ব্যবস্থা না থাকলে এর পরিবর্তে জমাটবাঁধা রক্ত গলিয়ে দেওয়ার চিকিৎসা বা 'থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি' শ্রেয়। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, দু ঘণ্টার পরে অ্যানজিওপ্লাস্টি করার চেয়েও তাৎক্ষণিক 'থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি' বেশি কাজের। এর প্রয়োজন আছে কি না, সেটা জানার জন্য পরীক্ষা হিসাবে অ্যানজিওগ্রাম করার দরকার নেই। বুকের ব্যথার ধরন, ইসিজি এবং চটজলদি ফল পাওয়া যায় ও যত্রতত্র বিনা যন্ত্রেই করে ফেলা যায় (আঙুলে ছুঁচ ফুটিয়ে এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে ট্রোপোনিন -'টি', সংক্ষেপে 'ট্রপ-টি') এমন রক্ত পরীক্ষা করে নির্ভরযোগ্যভাবে হৃদরোগের এই অবস্থার অস্তিত্বের উপস্থিতি নির্ণয় অথবা নির্মূল করা যায়।

(২) হৃৎপেশীর রক্তনালী (করোনারি আর্টারি) যথেষ্ট সরু ও সেটাই বুকে ব্যথার কারণ: এমন ধরনের রোগীদের মধ্য থেকে সঠিকভাবে নির্বাচিত একটা বড় অংশকে সঠিক ওষুধের দ্বারা সর্বোৎকৃষ্ট রোগনিয়ন্ত্রিত জীবন উপহার দেওয়া সম্ভব। মনে রাখতে হবে, অ্যানজিওপ্লাস্টির দ্বারা রোগ নির্মূল সম্ভব নয়। এমন ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য রোগীর বৈশিষ্ট্যের আরও কিছু কথা মাথায় রাখতে হয়। এই ধরনের রোগের চিকিৎসার একটা বিতর্কিত বিষয় আছে। **যেটা বিতর্কের উর্ধ্বে, সেটা হল, ওষুধ ও স্বাস্থ্যকর জীবনশৈলীর মাধ্যমে বুকের ব্যথা ও অন্যান্য রোগকষ্ট নিয়ন্ত্রণ করা গেলে অ্যানজিপ্লাস্টি অপ্রয়োজনীয়। আর অ্যানজিওপ্লাস্টি করার পরিকল্পনা না থাকলে, অ্যানজিওগ্রাম করাও অর্থহীন।** আর একবার স্মরণ করে নিই, রোগনির্ণয়ের জন্য রক্তনালীর ব্লকের অস্তিত্ব প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই। অ্যানজিওপ্লাস্টি বা বাইপাস

অপারেশনের বিস্তারিত কৌশল ঠিক করার জন্যই কেবল অ্যানজিওগ্রাম করা উচিত।

অনেক গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা প্রযুক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত একাধিক ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত (unbiased) ও কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত (not just by chance), নিরপেক্ষ, সমমাত্রার রোগপরিবেশে তার সফলতা প্রদর্শনের (randomized multicentric clinical trials) ওপর নির্ভরশীল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই খরচসাপেক্ষ পরীক্ষানিরীক্ষার দায়িত্ব এখন রাষ্ট্র বহন করে না। বহুজাতিক ব্যবসায়ীদের মুনাফা চালিত চিকিৎসা গবেষণাই এখন একমাত্র প্রমাণনির্ভর বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার দিশারি। সেই কারণে স্বাস্থ্যকর জীবনশৈলী সংক্রান্ত চিকিৎসা গবেষণা অবহেলিত হয়, প্রাধান্য পায় জটিল থেকে জটিলতর নতুন নতুন ধরনের স্টেন্ট-এর সফলতা প্রদর্শনের চেষ্টা। এটা আমাদের সৌভাগ্য (!), এখনও কোনো উচ্চমূল্যের সফল অ্যানজিওপ্লাস্টি আর স্টেন্ট প্রযুক্তি আমাদের অর্থনৈতিক অক্ষমতাকে বিদ্রূপ করতে পারে নি। যদি সেটা কোনোদিন সম্ভব হয়, তখন এই প্রতিবেদনটা পুনর্লিখন করতে হবে। রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ প্রতিরোধের ওপর ভরসা করতে হবে। এই ধরনের গবেষণার ফলাফল একত্র করে যে বিজ্ঞানসম্মত নির্দেশিকা চালু আছে সেটা জটিল। অ্যানজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস অপারেশনের সাফল্য হৃদপেশীর রক্তনালীর ব্লকের মাত্রা, সংখ্যা, অবস্থান, হৃদপিণ্ডের সঙ্কোচনের ক্ষমতা, বয়স, রক্তের সুগার ইত্যাদি হরেক রকমের নির্ণায়কের ওপর নির্ভরশীল। এই বিষয়ে আমলাতন্ত্রের সঙ্গে চিকিৎসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার তুলনা করা যেতে পারে। দুটোই জটিল ও সরলীকরণের চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না। আমাদের এ পোড়া দেশে ভালমতন গবেষণা হয় না। শহরকেন্দ্রিক যৎকিঞ্চিৎ গুটিকয় পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে, যে গুলোর মতে আমাদের দেশে অপ্রয়োজনে প্রায় ৫৫ শতাংশ অ্যানজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস অপারেশন করা হয় (টাইমস অব ইন্ডিয়া, মুম্বাই, ৪ জানুয়ারি, ২০১৫)। এটাকে কেবল অজ্ঞানতা ভাবলে ভুল হবে, এটা দুর্নীতিগ্রস্ত চিকিৎসা পরিষেবার এক ক্ষুদ্র ঝলক মাত্র।

সূত্র:

1. http://www.merckmanuals.com/home/heart_and_blood_vessel_disorders/atherosclerosis/atherosclerosis.html

2. Klinkman MS, Episode of care for chest pain: a preliminary report from MIRNET, Michigan Research Network: J Fam Pract 1994: 38(4): 345

3. Hueb W 1, Soares PR, Gersh BJ, César LA, Luz PL, Puig LB, Martinez EM, Oliveira SA, Ramires JA: The medicine, angioplasty, or surgery study (MASS-II): a randomized, controlled clinical trial of three therapeutic strategies for multivessel coronary artery disease: one-year results.: J Am Coll Cardiol. 2004 May 19; 43 (10): 1743-51.

4. Stary HC: Natural history and histological classification of atherosclerotic lesions: an update: Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2000 May;20 (5): 1177-8. Review.

5. Luke LC, Cusack S, Smith H, et al. Non-traumatic chest pain in young adults: a medical audit. Arch Emerg Med 1990; 7:183.

6. Pryor DB, Harrell FE Jr, Lee KL, et. al. Estimating the likelihood of significant coronary artery disease. Am J Med 1983; 75:771.

7. Goldman L, Weinberg M, Weisberg M, et al. A computer-derived protocol to aid in the diagnosis of emergency room patients with acute chest pain. N Engl J Med 1982; 307-588.

8. Lee TH, Cook EF, Weisberg M, et al. Acute chest pain in the emergency room. Identification and examination of low-risk patients. Arch Intern Med 1985; 145:65.

9. Renu Virmani, Frank D. Kolodgie, Allen P. Burke, Andrew Farb, Stephen M. Schwartz Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2000;20: 1262-1275, doi: 10.1161/01. ATV. 20.5.1262, Lessons From Sudden Coronary Death, A Comprehensive Morphological Classification Scheme for Atherosclerotic Lesions.

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্থান: পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিৎ ভট্টাচার্য (উয়ুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)। শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল।

পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার

ফোন নম্বর: ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৬৩৭।

পূর্ব কলকাতার জলাভূমি সমাজ

ধ্রুবা দাশগুপ্ত

বিড়াল, বেজি, ঘুটে, গবেট, পেটো! ঝামেলা! নাম বাছতে গিয়ে কত সুন্দর সুন্দর শব্দকে উপেক্ষা করে এইরকম নামও মানুষে রাখে? পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে সমীক্ষা করতে গিয়ে এইরকম সরস আবিষ্কার হবে, তা আমি ভাবতেই পারি নি। লোকে বলবেন, এই জলাভূমি নিয়ে অনেক তো গবেষণা হয়েছে। তাহলে নতুন করে আর কী জানবার আছে? এটা ঠিকই, এই জলাভূমির ওপর গবেষণা করে অনেক ছাত্রছাত্রীই তাদের নামের আগে 'ডঃ' শব্দটি অলঙ্কৃত করেছে। কত বিভিন্ন বিষয় নিয়েই না কাজ হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, আবার বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয় যথা জীববিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান, এমনকি ল্যান্ডস্কেপ আর্টিটেকচারের মতন গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়েও গবেষণা হয়েছে। তথ্যের পাহাড় জমেছে। তাহলে আবার নতুন গবেষণা কেন? আসলে বিদগ্ধ গুণীজন অবশ্যই অনেক এসেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁরা কেউই জলাভূমি অধিবাসীদের চোখ দিয়ে তাঁদের জীবন ও জীবিকাকে দেখার খুব একটা চেষ্টা করেন নি। এই প্রচেষ্টা আশ্চর্যরকমভাবে বিরল থেকে গিয়েছে।

আসলে আশ্চর্য হওয়ার হয়ত কিছুই নেই। নিজের বাড়ি থেকে যে বর্জ্যপদার্থ প্রতিদিন বেরিয়ে যায়, সেটা নিয়ে কে আর মাথা ঘামায় বলুন! তাই দেড়শো বছরের পুরনো একটি এলাকা আমাদের পরিচিত চৌহদ্দির এত কাছে থেকেও সেখানকার মানুষদের জীবনযাপন, চিন্তাভাবনা আমাদের অগোচরেই থেকে গিয়েছে। এই জলাভূমির মানুষজন, যাঁদের পরিবেশবিদ তথা জলাভূমি বিশেষজ্ঞ ডঃ ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ নাম দিয়েছেন 'জলাভূমি সমাজ', আমাদের শহর কলকাতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অনেকেই হয়ত শুনেছেন, পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে ময়লা জলে মাছচাষ হয়। কিন্তু যাঁরা এই চাষটা করেন এবং আমাদের শহর কলকাতাকে টাটকা মাছ, প্রতিদিনের সবজি দেন, তাঁরা আসলে কারা? কেমনভাবে জীবনযাপন করেন? এটা কলকাতাবাসী কখনই জানতে চান নি। প্রকৃতিপ্রেমীরা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে এই জলাভূমির আসল গুরুত্ব তার জীববৈচিত্র্য, বিশেষ করে পাখিদের বৈচিত্র্য। কিন্তু এই জলাভূমিটিকে কারা টিকিয়ে রেখেছেন তাঁদের জীবননির্বাহ করে, সেই মৌলিক প্রশ্নটা কেউ কখনও তেমন করে দেখেন নি। এটা কলকাতার একটা অসাধারণ ইতিহাস যা সম্পর্কে গর্ববোধ করা দূরস্থান, কেউ বিন্দুমাত্র গবেষণা করা বা জানার কোনো চেষ্টাই করেন নি। অথচ এই আমরাই কিন্তু বিশ্বের যে কোনো জায়গায় সাধারণ মানুষের ওপর হওয়া অত্যাচারের প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে চায়ের পেয়ালায় তর্কের তুফান তুলি। আশার কথা, ইকোলজির তত্ত্বে এবং প্রয়োগে সম্পূর্ণ নতুন বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির জন্মও এই কলকাতাতেই। পূর্ব আলোচিত এই তথ্যের অসম্পূর্ণতাকে খানিকটা পূরণ করার চেষ্টা আমরা করছি। তাই এই জলাভূমির মানুষদের উপলব্ধি নিয়ে, তাঁদের পরিবেশ এবং জীবন-জীবিকাকে ঘিরে যে তাঁদের চেতনা— সেই চেতনার স্তরকে আরো কাছ থেকে জানতে এবং বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অভ সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চের আওতায় একটি গবেষণার কাজ চলছে। যার মূল অংশ হল একটি সমীক্ষা। এটির তথ্য বিশ্লেষণের কাজ এখনও চলছে, তাই সম্পূর্ণ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু সেই সমীক্ষার মাধ্যমে যে বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার কিছুটা তুলে ধরলাম।

পূর্ব কলকাতার মাছের ভেড়ির শ্রমিকদের নিয়ে এই সমীক্ষা। পরিবেশ দপ্তর ১৯৯৭ সালে সক্রিয় ভেড়িগুলির একটি তালিকা তৈরি করে। তারপর থেকে অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং বর্তমানে আমরা কাজ চলছে, এমন ভেড়ির ১০ ভাগের এক ভাগে সমীক্ষার কাজ করেছি। প্রথম সমীক্ষার অভিজ্ঞতায় ভেড়ি শ্রমিকদের ভীত-সন্ত্রস্ত দেখলাম, না জানি কী অজানা পরীক্ষা দিতে এসেছে! উত্তর না জানলেই বলছে, 'আমার তো বেশি লেখাপড়া জানা নেই, তুমি যেটা ঠিক মনে করছ সেটা বসিয়ে নাও না!' পূর্ব কলকাতার জলাভূমি যে একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রামসার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জায়গা,

এই চেতনা প্রায় কারুর মধ্যেই নেই। সত্যি কথা বলতে কি, সংরক্ষণ বোধ তো দূরস্থান, রামসার খায় না মাথায় দেয়, এই কথাই কেউ জানে না। অথচ ১৩ বছর হতে চলল, পূর্ব কলকাতার জলাভূমি তার অনন্যতার স্বীকৃতি বিশ্বের দরবারে পেয়েছে। অবাক কাণ্ড, এখানকার মানুষদের জীবনে কিন্তু তার কোনো ছাপ পড়ে নি। এই গোটা জলাভূমি এলাকায় হাতে গোনা যায় এমন সংখ্যক মানুষ রামসার স্বীকৃতির কথা শুনেছেন বা বোঝেন যে, এটা তাঁদের জীবন-জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হতে পারলে ভাল হবে। যাদের জানানোর দায়িত্ব ছিল, তারা আশ্চর্যরকমভাবে নিশ্চুপ। ভেড়ির শ্রমিকদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা উভয়েই আছে, কিন্তু শিশু শ্রমিক নেই। সাধারণত আমরা যে ভেড়িগুলিতে সমীক্ষা করেছি, সেখানে ১৬ বছরের নীচে শ্রমিক কাজ করে না। এছাড়া, মহিলা ও পুরুষদের কাজের মূল ফারাক হল যে মহিলারা জলে নামেন না, তাঁরা সাধারণত দিন পাহারা আর বাঁধ পরিষ্কার করার কাজ করে থাকেন। অবশ্য পুকুর/ভেড়ি শুকনো করা হলে তখন মহিলারা পরিষ্কার করার কাজ করে থাকেন।

জলাভূমি এলাকায় শিক্ষার হার সাধারণভাবে নিম্নমানের। কিন্তু নিজের জীবন-জীবিকার ব্যাপারেও অনেকেই গুছিয়ে কথা বলতে পারবেন না, একথা ভাবতে পারি নি। গোড়ার দিকে একটা ভেড়ির সমীক্ষার থেকে একজন শ্রমিক বাদ পড়ে গিয়েছিল। তাঁকে খুঁজে বের করে আনতে কিছুটা সময় লেগে যায়, ফলে তাড়ায় ছিলাম যে, এই একটি লোকের প্রশ্নপত্র খুব দ্রুত ভরা শেষ করতে হবে। সেই দিনের জন্য আরও অনেক কাজ বাকি। কিন্তু অনেক সময়েই আমরা ভাবি এক, আর হয় আরেক। খুব ভয়ে ভয়ে লোকটি আমার পাশে এসে বসল। বিহারের অধিবাসী, বর্তমানে শ্বশ্রূমাতার পরিবর্তে ভেড়িতে কাজ করেন। দেখে মনে হল লজ্জা আর ভয় একসঙ্গে পেয়েছেন। প্রথম গোটা দশেক প্রশ্নের ঠিকমতন উত্তর দিতে পারেন নি। খালি হাত নাড়াচ্ছেন আর বলছেন, 'বলতে পারব না।'

হঠাৎ পাশ থেকে প্রায় গর্জনের মতন মহিলাকণ্ঠ ভেসে এল, 'এদিকে এসো!' ঘাবড়ে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি ঐ শ্রমিকের স্ত্রী রক্তচক্ষু করে তাঁকে ডাকছেন। ভয় পেয়ে লোকটি কাছে যেতেই গর্জে উঠলেন, 'তুমি কিছু জানো না! কেন কিচ্ছু জানো না? যা বলেছে তার উত্তর দিতে পারছ না! ওকে জিজ্ঞাসা করো!' বলেই, আমি কিছু বলতে পারার আগেই একজন ভেড়ির শ্রমিককে দেখিয়ে দিলেন, যাঁর তথ্য কয়েকদিন আগেই আমরা নিয়েছি। তিনি এই ভেড়িরই শ্রমিক, অভিজ্ঞতায় এঁর থেকে এগিয়ে।

আমাদের কমবয়সী গোবেচারা বাবাজীবন প্রায় লাফিয়ে পড়ে তাকে হাত ধরে টানতে লাগল, 'দাদা, উত্তর বলে দাও। কিচ্ছু জানি না, ভুল উত্তর হচ্ছে। পরীক্ষা পারব না।'

সেই শ্রমিক হেসে ফেললেন। তিনি জলখাবার খেতে যাচ্ছিলেন দোকানে। আরে কিছু হবে না, দিদি যা জিজ্ঞাসা করছে তা না জানলে বলবে জানি না, ভয়ের কিছু নেই। আরে আমারও তো হয়েছে।'

আরে তুমি বুঝছ না, আমি জানি না! তাহলে কী হবে? পরীক্ষায় পাশ হবে না, কিছুতেই না। তুমি বলে দাও।'

দুই পক্ষই সিনিয়র শ্রমিককে নিয়ে টানাটানি করছে— একদিকে বউ, অন্যদিকে উত্তরদাতা। তিনিও উত্তর দিতে রাজি নন। আবার একদিকে ঐ শাশুড়ির অসম্ভব বকুনি, অন্যদিকে দাদাও সাহায্য করছেন না, লোকটি অত্যন্ত অসহায়ভাবে উত্তর দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমি মনে মনে প্রমাদ গুনলাম— দুই তৃতীয়াংশ প্রশ্ন তো বাকি, উত্তর না দিলে কী করে হবে?

মরিয়া হয়ে বোঝালাম, 'ভাইরে, আপনার কথাটুকুই জানতে চাই, না জানলে উত্তরটা 'জানি না' বলে দেবেন। তাতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। ভেড়ির বাকি সকলেও তাই বলেছে। বলাই বাহুল্য, এই ভীত শ্রমিকটি আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইছেন না।

আগের দিনের শ্রমিকটি করুণা করে আমাকে অভয় দিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ শ্রমিককে বললেন, 'যা জান তাই বলে দাও, দিদি লিখলে তোমার ভয় নেই। তোমারই ভাল হবে, দেরি করো না, আমি এখন খেতে যাচ্ছি। তুমিও উত্তর দিয়ে আস্তে আস্তে চলে এসো।' অগত্যা শ্রমিকটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাকি উত্তরগুলি দিল। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। একটা প্রশ্নপত্র শেষ করবার জন্য একজন শ্রমিক ১০ মিনিট সময় দিলেই চলে। কিন্তু এখানে আমাদের আধ ঘণ্টা লেগে গেল। ওই মহিলা দুজন যদি কিছু না বুঝে বাধা না দিতেন, তাহলে এতটা সময় নষ্ট হত না।

এই দুই মহিলার তেজ দেখে অবশ্যই ভাববেন না যে জলাভূমি এলাকায় মহিলাদের খুব দাপট আছে। তা কিন্তু আদৌ নয়। ভারতের অন্যান্য জায়গার মতো তাঁদের শিক্ষার হার পুরুষদের থেকে কম। এবং পুরুষরা সাধারণত ভাবেন যে মেয়েরা কোনো ব্যাপারে বেশি দক্ষতা দেখাতে পারবেন না। সমীক্ষার তিন মাস বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেছি। অনুভব করেছি, একজন মহিলা সমীক্ষা বা কোনো কাজের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, এটা ওঁরা ভাবতেই পারেন না। এই মানসিকতা যে

ওঁদের কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করে, ভেড়ির লোকেদের মধ্যে এই নিয়ে কোনো চৈতন্যই নেই। ভেড়ির শ্রমিকদের অন্যায়ভাবে শাসাতে হলে প্রথমে তাঁদের বাড়ির মহিলাদের নিশানা করা হয়। ভয় দেখানো হয়, যাতে তাঁদের বাড়ির লোকেরা যেন কোনোমতেই অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে। যারা ভেড়ি এলাকায় জলাভূমি সমাজের ক্ষতি করতে চায়, তারা নির্দ্বিধায় মেয়েদের দুর্বলতা এবং অশিক্ষার সুযোগ নেয়। এই সম্পর্কে জলাভূমি সমাজের চেতনার খুবই অভাব আছে। মেয়েদের শিক্ষার উপযুক্ত প্রসার না হলে এই দুর্বলতা জলাভূমির মানুষদের অনেক বেশি ক্ষতির মুখে ঠেলে দেবে।

যে সব মানুষ বড় খালের কাছের ভেড়িতে কাজ করেন বা খালের কাছে বসবাস করেন অথবা বাইপাসের কাছে যাঁদের ভেড়ি, তাঁরা সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে সবচেয়ে বেশি অনিচ্ছুক ছিলেন। কাজেই সবচেয়ে বেশি বাধা পেয়েছি বাইপাস সংলগ্ন ভগবানপুর মৌজার অংশ আর চৌবাগা মৌজা থেকে। আবার, বালাভূতিয়া মৌজায় শ্রমিকেরা মনে করেছেন, ভবিষ্যতে কোনোমতেই ভেড়ি ভরাট আটকানো যাবে না। স্বাভাবিকভাবেই, এই এলাকাগুলিতে জমির চরিত্র পাল্টানোর আয়োজন এবং জমির দালালদের তৎপরতা অনেক বেশি। তাই পূর্ব কলকাতার জলাভূমির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে অন্যান্য দপ্তরের সাহায্য নিয়ে এই এলাকাগুলিতে জমির চরিত্র পরিবর্তনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যস্থা গ্রহণ করতে হবে। আবার, জেলার উচ্চ প্রশাসনিক সাহায্য না পেলে এই কাজ করা অসম্ভব।

পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে তৈরি মাছ বিক্রি হয় সাতটি আড়তে। আগে বিক্রি হত ৫টিতে— কেষ্টপুর, চিংড়িঘাটা, বামনঘাটা, বানতলা ও চৌবাগা। এখন তাতে আরও দুটি আড়ত যোগ হয়েছে— গঙ্গাজোয়ারা আর গড়িয়া। এই আড়তের সমীক্ষা আমাদের কাজের একটা আলাদা অঙ্ক হিসেবে পরিকল্পিত হয়েছিল। কিন্তু আমরা এই কাজে আংশিকভাবে সফল হয়েছি। এই এলাকার আড়তগুলি সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে। শিয়ালদহের কোলে মার্কেটে যেমন প্রতিটি কাঁটায় নিয়মিত হিসেব পরীক্ষা বা অডিট হয়। এখানে কিন্তু কোনো আড়তেই তা হয় না। তাই অনেক টাকা প্রতিদিন হাতবদল হলেও একটা চাপা গোপনীয়তা প্রত্যেক আড়তদারের মনে, মস্তিষ্কে কাজ করে। তাঁরা সরকারের থেকে কোনো সুযোগ সুবিধা বা সাহায্যও চান না। কিন্তু তাঁরা মৎস্যচাষের জন্য প্রয়োজন মতো ভেড়িকে দাদন দেন এবং ভেড়ির শ্রমিকেরা তাঁদের ওপর নির্ভরশীল। এইটি একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর জায়গা, যেখানে গবেষণার কাজ করা দুরূহ, অথচ অত্যন্ত জরুরি। ভেড়িতে মালিকানা প্রথা অনেক সঙ্কুচিত হয়ে যাওয়ার পর যে সমবায় সমিতিগুলির গোড়াপত্তন হয়, তাদের ধরে রাখে দুই দিক থেকে যথাক্রমে ছোট মাছ/ডিম ব্যবসায়ী গোলদার, আর আড়তের ব্যবসায়ী, এমনটাই শোনা গিয়েছে।

মালিকানা ব্যবস্থা অনেকটাই চলে গিয়েছে। কিন্তু মালিকেরা লিজ দিয়ে দিয়েছে এমন অনেক ভেড়ি আছে। সমীক্ষা করতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, সব ভেড়িতে রোজগার কিন্তু এক নয়। দিন হিসাবে যে রোজগার সমবায় ভেড়িতে হয়, তার থেকে মালিকানা ভেড়ির রোজগার কম। বাসন্তী রোডের দক্ষিণ দিকের ভেড়িগুলির মধ্যে অনেক মালিকানা ভেড়ি আছে। সব ভেড়ি মিলিয়ে সর্বোচ্চ রোজগারের হার এখন দিনে ২০০ টাকা আর সর্বনিম্ন ৮০ টাকারও কম।

পূর্ব কলকাতার জলাভূমির ৩২টি মৌজার মধ্যে সবচেয়ে করুণ অবস্থা ভগবানপুর মৌজার। ১৯৯৭ সালে পরিবেশ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে জলাভূমির প্রত্যেকটি মৌজার তৎকালীন জীবিত ভেড়িগুলির যে তালিকাটি তৈরি করা হয়েছিল, তাতে ভগবানপুর মৌজায় ৪৭টি ভেড়ি ছিল, এখন তার মধ্যে ৩৫টি ভরাট করা হয়ে গিয়েছে। ভগবানপুর মৌজার একটি বড় অংশ খেয়াদহ ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতায় আসে। সমীক্ষা চলাকালীন অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, এই পঞ্চায়েতের এক দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিকর্তা সগর্ব এক প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ২০১৬ সালে জলাভূমি আইন উঠে যাবে। শুনেছি তাঁর কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হয়েছিল এবং তিনি ভুল স্বীকার করেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হয়ে যায় নি। কয়েকদিন আগে তারদহ অঞ্চলের প্রধান প্রকাশ্য জনসমাবেশে ঘোষণা করেছেন, তিনি এলাকার লোকেদের থেকে সই জোগাড় করবেন এবং সরকারের কাছে পেশ করবেন এই মর্মে যে, তারদহ এবং তারদহ কাপাসাতি মৌজার লোকেরা চান, তাঁদের এলাকা যেন পূর্ব কলকাতার জলাভূমি এলাকার বহির্ভূত করে দেওয়া হয়। এই কথা বলে তিনি সদর্পে ইংরেজি একটি পত্রিকাকেও বিবৃতি দেন। পঞ্চায়েত স্তরে এত অসামান্য তৎপরতা এবং নির্লজ্জ লোভ আর ঔদ্ধত্য যখন গ্রামজীবনের মূল স্তরে এতটা ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে, তখন জলাভূমি সংরক্ষণের ভবিষ্যৎ কী? উত্তর সহজ নয়।

আমাদের এই সমীক্ষার কাজ আই সি এস এস আর-এর অর্থনৈতিক সাহায্যপুষ্ট এবং ইস্টার্ন রিজিওনাল সেন্টারে স্থাপিত।

আমরা সমস্তরকম ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে– মুক্তচিন্তার পক্ষে

ওরা ভয় পেয়েছে

হ্যাঁ, ওরা ভয়ই পেয়েছে অভিজিৎ। আর ভয় পেয়েছে বলেই তোমার ওপর নামিয়ে এনেছে চরম আঘাত। আমরা তোমাকে হারিয়েছি, কিন্তু হারিয়েছি বলে থেমে যাই নি। তোমার সাথী হিসেবে আমাদের পথ চলায় যোগ হয়েছে আরও জেদ আরও আত্মবিশ্বাস।

চিঠি লেখা ছেড়ে আসি মূল খবরে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সকালবেলা খবরের কাগজ মারফত জানলাম যে আমেরিকা প্রবাসী বিশিষ্ট প্রগতিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক লেখক অভিজিৎ রায়কে কে বা কারা কুপিয়ে খুন করেছে। অভিজিতের স্ত্রী রফিদা আহ্মদ বন্যাকেও আঘাত করতে তারা ভোলে নি। সাংঘাতিকভাবে আহত বন্যা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিজিৎ তাঁর লেখা দুখানি বই ২১শের বইমেলায় প্রকাশ করার জন্য তাঁর পরবাস ছেড়ে নিজের দেশে এসেছিলেন। খবরে প্রকাশ যে, এ বছরের মেলা চত্বর পুলিশি প্রহরায় একেবারে নিশ্ছিদ্র ছিল। অথচ আশ্চর্য এই যে, এই নিশ্ছিদ্রতা ভেদ করে রাত ৯টার সময় ভিড়ে ঠাসা মেলা প্রাঙ্গণের পাশে চায়ের দোকানে চা পানরত দম্পতিকে খুনের চেষ্টা করা হল। আর সেই চেষ্টার ফলে অভিজিতের জীবনদীপ নিভে গেল আর স্ত্রী বন্যা সাংঘাতিক আহত অবস্থায় ভর্তি হলেন হাসপাতালে। অথচ খুনি কারও চোখে পড়ল না। এবং ঘটনা ঘটার দু'দিন পরেও কে বা কারা খুন করেছে জানতে পারা গেল না। এ ব্যাপারে প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথে বাংলাদেশের খুব মিল আছে। ভারতেও যে কোনো ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর দিনের পর দিন কেটে যায়, আসল অপরাধী ধরা পড়ে না।

তবে এ ক্ষেত্রে সুখের কথা এই যে, ঘটনা ঘটার ৫-৬ দিনের মাথায় অভিজিতের হত্যার আসল ষড়যন্ত্রকারী ধরা পড়েছে। যেহেতু অভিজিৎ আমেরিকায় বসবাসকারী একজন মুক্তমনা বিজ্ঞানী এবং একজন নিরীশ্বরবাদী বিজ্ঞানমনস্ক লেখক সেই কারণে তাঁর হত্যার ঘটনাটি অতি দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের বিদ্বৎসমাজ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে এই প্রশ্ন তুলে ধরেছেন যে বাংলাদেশ থেকে স্বাধীন চিন্তাকে নির্মূল করার জন্য মৌলবাদী সন্ত্রাসকে কি প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে? মৌলবাদীদের দাবি মেনে লেখিকা তসলিমা নাসরিনের নির্বাসনের মধ্য দিয়ে যে ঘটনার শুরু হয়েছিল তার রেশ টেনে কয়েক বছর আগে এই মৌলবাদীরা কবি শামসুর রহমানের বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল। হামলা করেছিল লেখক হুমায়ুন আজাদের ওপর, হত্যা করেছিল রাজীব হায়দরকে। এরপর এ বছর তারা খুন করল অভিজিতকে। কিন্তু কেনই বা হত্যা কেনই বা হত্যার চেষ্টা? কারণ হিসেবে দুটি বিষয় বোধহয় বলাই যায়। প্রথমত, সত্যকে তুলে ধরার, তাকে প্রতিষ্ঠিত করার লোকের সংখ্যা বাড়ছে। দ্বিতীয়ত, ধর্মান্ধতার দিন শেষ হয়ে আসছে। ধর্মের নামে, জাতের নামে জালিয়াতি দেশের বেশিরভাগ মানুষ আর মানতে চাইছেন না। তাই ধর্মীয় মৌলবাদীরা ভয় পেয়ে সন্ত্রাসের রাস্তা বেছে নিয়েছে। কিন্তু এইসব মৌলবাদীদের মনে রাখতেই হবে যে গ্যালিলিওকে বন্দী করে পৃথিবীর চারপাশে সূর্যকে ঘোরানো যায় নি। ঠিক তেমনি 'আমি ঈশ্বরের দূত, আমার সাথেই ঈশ্বরের যোগ রয়েছে' চার্চের পাদ্রীদের বলা এই কথাগুলিও সত্যি হয়ে ওঠে নি।

প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রাকৃতিক নিয়মেই চলছে। ঈশ্বর এবং ধর্ম দিয়ে সেই বিশ্বাস পাল্টানো যাবে না।

মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল, আছে, থাকবে। এই স্বাধীন মত প্রকাশ করার অপরাধেই অভিজিতের ওপর নেমে এসেছে চরম আঘাত, তাঁর প্রিয়জনদের থেকে, সমমনস্ক সাথীদের থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু নিতে পারে নি তাঁর বিশ্বাস, তাঁর চিন্তাভাবনা আর আদর্শকে। তাই তাঁর মনের মাধুরী দিয়ে বড় করে তোলা কন্যা তৃষা বাবার মৃত্যুর প্রতিবাদে এ কথা বলতে পারে যে, 'বিশ্ব কোনো কিছু গ্রাহ্য না করলেও তাকে সুন্দর করার লড়াই থামিয়ে দেওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। বাংলাদেশ একটি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ, সেখানে নেই কোনো আইনশৃঙ্খলা। তাই হত্যাকারীদের কোনো বিচার হবে কি না তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমি চাই বাবার কথা আপনারা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিন।'

অভিজিতের বাবা শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অজয় রায় সন্তানের মৃত্যুর পর তাঁর শবাধারের পাশে দাঁড়িয়ে শোকার্ত কণ্ঠে বলেন, 'মৌলবাদীরা যখন আমার ছেলেকে হত্যার হুমকি দিচ্ছিল, তখন আমি আই জি পি, ডি আই জি সকলকে জানিয়েছিলাম। তারপরও এই হত্যাকাণ্ড ঘটল। এই হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করে যে তারা কত দরিদ্র ও ব্যর্থ।' শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক রায় বলেন যে, 'তুমি আমার ছাত্রীর মতো। মৌলবাদীদের নির্মূল না করলে তুমিও বাঁচবে না।'

সবশেষে বলি, অভিজিৎ! তোমার আদরের তৃষার আবেদন মেনে আমাদের সীমিত সাধ্য দিয়ে তোমার বিশ্বাস ও মতকে জনমানসে তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাব। এই লেখা তারই এক পদক্ষেপ মাত্র।

পূরবী ঘোষ

সূত্র: দৈনিক স্টেটসম্যান

বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে ধর্মীয় অন্ধতাও বেড়ে চলেছে

৬০ থেকে ৭০ লক্ষ মানুষের সমাবেশ হয়ে গেল ফিলিপিন্সের মাটিতে। পোপ প্রথম ফ্রান্সিসের অন্তিম দিনের সমাবেশে ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ মানুষ উপস্থিত হন শুধু তাঁকে চোখের দেখা দেখবার জন্য। জনসংখ্যার নিরিখে এশিয়ার বৃহত্তম ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসীদের এই দেশ। ৭৮ বছরের ফ্রান্সিস ম্যানিলার রিজার পার্কে যখন বক্তৃতা করবেন, তখন প্রায় সবাইকে অবাক করে দিয়ে ১২ বছরের এক অনাথ শিশুকন্যা, নাম প্লিজেল আইরিশ প্যালোমার পোপকে প্রশ্ন করে, শিশুদের তো কোনো দোষ নেই, তবে কেন মা-বাবা তাদের ছেড়ে চলে যান? কেন পেটের দায়ে শিশুরা বাধ্য হয় বইখাতা সরিয়ে রেখে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে? কেনই বা শিশুদের দেহব্যবসায় নামতে হয়? কেন তাদের এমন শাস্তি দেন ঈশ্বর?

স্বভাবতই প্লিজেলের প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন নি পোপ ফ্রান্সিস। কিন্তু যাতে এ ধরনের প্রশ্ন কেউ করতে না পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলেন চার্চের আধিকারিকদের।

আসলে আমাদের দেশের পোপেরা বলতে শুরু করেছেন, গণেশের মাথায় হাতির মাথা নাকি প্লাস্টিক সার্জারির ফসল। কৌরব বংশে শত পুত্রের জন্ম টেস্ট টিউব বেবির টেকনোলজি, সেই পুরাণের সময়কার তৈরি। আর বিজ্ঞান কংগ্রেসে পুরাণ পাঠের প্রস্তাব সমস্ত কিছু মিলেমিশে একাকার। কোথায় সেই মাথা উঁচু করা বিজ্ঞানীগণ? একটা শিশু যা পারে তা আপনারা পারেন না কেন? কেন এই অবিজ্ঞান বা অপবিজ্ঞান থেকে বিজ্ঞানের সঠিক দর্শন তুলে আনতে পারেন না? আসলে এইসব প্রশ্নগুলো শিশু-কিশোর যুবকেরা তুলুক, এতেই হয়ত কিছু হতে পারে সমাজে।

মাত্র ৬ দিনের শিশুর মৃত্যুর পর দেহাংশ নিয়ে বাঁচল ২ জন

ঘটনার স্থান লন্ডন। মাত্র ৬ দিনের বেঁচে থাকা, তারপর সব শেষ। কিন্তু তার বাবা-মায়ের মুক্ত চিন্তা এই ৬ দিনের শিশুকে অমর করে দিল। শিশুটির মৃত্যুর পর তার বাবা-মা সিদ্ধান্ত নিলেন তার দেহাংশ যদি কোনো মৃত্যুপথযাত্রীকে দেওয়া যায়। হলও তাই। ও দেশে মৃত্যু মানে মস্তিষ্কের মৃত্যু। তাই কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন এক ব্যক্তি, অন্য জন লিভার সংক্রান্ত অসুবিধায়। জবাব দিয়ে দিয়েছিল হাসপাতাল। ৬ দিনের শিশুটির দেহ থেকে কিডনি ও লিভার নিয়ে তা প্রতিস্থাপিত করা হল দুই মৃত্যুপথযাত্রীর শরীরে। বর্তমান সময়ে এর চেয়ে কমবয়েসি কেউ দেহাংশ দান করেছে বলে জানা নেই ওখানকার স্বাস্থ্যদপ্তরে। প্রতিস্থাপনের পর ২ জন রোগীই ভাল আছেন।

বিবর্তন ভট্টাচার্য

শিশু সম্পদ, না সমস্যা

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র ১ — গরুর পিঠে আট বছরের বুধন, তার হাতে একটা কঞ্চি। পিছনে আরও আট-দশটা গাই-গরু, চলেছে দিঘির পাশের মাঠটিতে গরু চরাতে। গরমের দিন বলে আদুল গা, পরনে ইজের। বুধনের মুখে সরল হাসি। মাঠের পাশে ঝাঁকরা জামগাছটায় এখন পাকা পাকা জাম, আজও পেড়ে খাবে। গরুর পাল নিয়ে ফিরবে দুপুর দুটোয়, তারপরে স্নান করে পান্তা খেয়ে অন্য কাজ। গাঁয়ের পাঠশালে সে কিছুদিন গিয়েছিল, কিন্তু বেশিদিন পড়তে পারে নি। তার বাবা তাকে গরু চরানোর কাজে লাগিয়ে দিল সংসারে কিছু পয়সা আসবে বলে। তাই এক বছর ধরে বুধন এই কাজই করছে।

চিত্র ২ — রেণুর বাবা চাষী অর্থাৎ ভূমিহীন কৃষক। রেণুরা ৩ বোন, ১ ভাই। ও বড়, বয়স ১২। শরীরটা একটু মোটাসোটা, ভারী ধরনের। শহরে বাবুদের বাড়িতে কাজে ঢুকেছে। বাবুর বাড়িতেই থাকে। বাসন ধোয়া, কাপড় কাচা, ঘর মোছা তো আছেই, তা ছাড়া গিন্নীর ফরমায়েস দিনভর লেগেই আছে, 'এটা কর, ওটা কর'। কাজে ভুলচুক হলে মুখ ঝামটা, কিছু জবাব দিলে রেগে গিয়ে গরম খুন্তির ছ্যাঁকা। বাড়ির বড় ছেলেটা একদিন দুপুরে একলা পেয়ে রেণুকে জাপটে ধরে কি অসভ্যতা করেছিল, গিন্নীকে বলতে গেলে ঠাস্ করে গালে একটা চড় কষিয়ে ধমক— 'যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!'

চিত্র ৩ — রফিক মোটর গ্যারেজে কাজ করে। এই ১৪ বছর বয়সেই টুকটাক কাজকর্মে সে ওস্তাদ। গাড়ির চাকায় হাওয়া দেওয়া, কলকব্জার নাটবল্টু খুলে কেরোসিনে ডুবিয়ে রাখা, টিউবের লিক্ বের করে তা সারাই করা, কী করে না সে! বড় মিস্ত্রি আবদুলের ডান হাত। এই বয়সেই রফিক বিড়ি ধরেছে, একটা সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল ফোনও কিনে ফেলেছে, তাতে হিন্দি গান শোনে। বড় মিস্ত্রির চড়চাপড় মাঝে মধ্যে খায় বটে তবে কাজ শিখতে তার আগ্রহ খুব। রাতে গ্যারেজেই একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর ঘুমোয়, খাওয়াদাওয়া পাশের ঘুপচি হোটেলে। ওর আব্বা ভ্যানরিকশা চালায়। ৫ ভাই-বোন। রফিক আগে কিছুদিন পাঠশালায় গিয়েছিল কিন্তু কেন ছেড়ে দিয়েছে, এখন আর মনে পড়ে না। মাসে মাসে ওর আব্বা এসে টাকা নিয়ে যায় ওর কাছ থেকে।

এই চিত্রগুলো আমাদের সবারই খুব পরিচিত। কোনও নতুনত্ব নেই এর মধ্যে। এরা সবাই শিশুশ্রমিক, খুব চেনা চরিত্র। চায়ের স্টলে, মিষ্টির দোকানে, গরুর গোয়ালে, ফুটপাথে জুতো পালিশ করায় এরাই অগ্রণী। এমনকি বাজিপটকার বিপজ্জনক কারখানাতে এদের চাহিদাই বেশি। কম পয়সায় জলদি কাজ। শৈশব কৈশোর বলে এদের কিছু নেই। নেই খেলার মাঠ, নেই শিক্ষা, নেই স্বপ্ন। কিন্তু আছে দায়িত্ব, পরিশ্রম আর অপমান। এরাও কিন্তু আমাদের ১২৫ কোটি ভারতের নাগরিক। ক্ষুধা বড় বালাই যা মানুষের সর্বস্ব গ্রাস করে। দারিদ্রলাঞ্ছিত সংসারে এদের শৈশব বিসর্জিত হয়, অবহেলিত হয় প্রস্ফুটনের ক্রান্তিকালে উজ্জ্বল কৈশোর। খেলাধূলা, স্কুল ছেড়ে জীবনের সোনালি দিনগুলোয় এদের বের হতে হয় সংসারের ঠেলায় পেটের জ্বালায়। অপরিণত বুদ্ধিতে মাঝে মাঝে দুর্ঘটনায় পড়ে গেলে পরে বিপন্ন হয় জীবন। শিশুমৃত্যুর হার আমাদের দেশে সর্বাধিক। 'শিশু' কথাটি এখানে যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ যারা ১৮ বছর বয়সের কম তাদের কথাই বলা হচ্ছে। বিশাল ভারতে এদের সংখ্যা ৪০ কোটি। কৈলাস সত্যার্থী শিশু নিয়েই অসাধারণ কাজ করে এ বছর নোবেল প্রাইজ পেলেন।

কিছু তথ্য কিছু অনুসন্ধান : আমাদের দেশের সংবিধানে মানবাধিকার বলে একটা কথা আছে। কিন্তু বাস্তবে এখানে শিশুদের মানবাধিকারের ক্ষেত্রে তাদের পুরো নাগরিক হিসেবে দেখা হয় না। তাদের কম বয়সের জন্য শিশুদের আধা-নাগরিকের মতো ভাবা হয়। রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ অনুযায়ী শিশুদেরও কিন্তু একজন প্রাপ্তবয়স্কের মতো সমান অধিকার

আছে। শিশুদের অধিকারগুলো কী? **(১) বেঁচে থাকার অধিকার**— পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য ও স্বাস্থ্য পরিষেবা ও নাগরিকত্বের অধিকার। বাস্তব ক্ষেত্রে এ দেশে প্রতি দুটি শিশুর মধ্যে একটি অপুষ্টিতে ভোগে। অপুষ্টি একটি মার্জিত ভাষা, আসল মানে হল, না খেতে পাওয়া। অর্থাৎ ৪০ কোটির মধ্যে ২০ কোটি ঠিক মতো খেতেই পায় না। পায় না স্বাস্থ্য পরিষেবাও। **(২) নিরাপত্তার অধিকার**— কোনও বিপজ্জনক ক্ষতিকারক কর্ম ও নিপীড়নমূলক কাজ না করার অধিকার। বাস্তবে এখানের ১২ শতাংশ শিশুই আজ শিশুশ্রমিক। বাজিপটকা কারখানার মতো বিপজ্জনক রাসায়নিক মশলা তৈরির কাজেও শিশুরা নির্বিচারে নিয়োজিত। দুর্ঘটনায় প্রাণও যায় অনেকের। **(৩) উন্নয়নের অধিকার**— বিনামূল্যে শিক্ষা ও মানসিক বিকাশের অধিকার। তথ্য বলছে, এদেশের দারিদ্র্যসীমার নীচের ৪০ শতাংশ শিশুই প্রাথমিক শিক্ষা মাঝপথে ছেড়ে দেয় বা দিতে বাধ্য হয়। মেয়েদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে বেশি খারাপ। **(৪) সুস্থ স্বাধীন ভাবনাচিন্তার অধিকার**— ছেলে বা মেয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও মতামত প্রকাশ করার অধিকার। কিন্তু আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ৪৫ শতাংশ কিশোরীর বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় ১৮ বছর বয়সের আগেই।

কাগজে-কলমে থাকা নানাবিধ শিশু অধিকার পদে পদে লঙ্ঘিত হয় অনুন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশে। তার মূলে রয়েছে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা। ভারতের ৪০ কোটি শিশুর অর্ধেকই এখনও শিশুশ্রম ও শিশু নিপীড়নের শিকার। ক্ষুধা, ব্যাধি ও অবহেলা তাদের শৈশব কৈশোর তছনছ করে দেয়— কী তাদের অধিকার, কে তার খবর রাখে! কোটি কোটি দরিদ্র পরিবার যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা, তারা সামান্য টাকার জন্যে তাদের শিশুসন্তানদের ঠেলে দিতে বাধ্য হয় নানান কাজে। আগে তো খেয়ে বাঁচতে হবে, তারপর শিক্ষা, উন্নয়ন। ক্ষুধা বড় ভয়ঙ্কর যা মানুষের সর্বস্ব ধ্বংস করে। এতে শৈশব লুণ্ঠিত হয়, মানবিকতা মাথা কুটে মরে। তাই সরকার সর্বশিক্ষা অভিযানে দেশের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা করেছেন। যার লোভে শিশুদের মা-বাবারা তাঁদের সন্তানদের পাঠশালায় পাঠাচ্ছেন। পড়াশোনা কিছু হোক না হোক দুপুরে ভরপেট খাওয়া তো জুটবে! অস্বীকার করার উপায় নেই সর্বশিক্ষা অভিযানে দেশের প্রত্যন্ত এলাকাতেও মিড-ডে মিলের ব্যবস্থায় শিশুদের বেশ কিছুটা বিকাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে। কমছে নিরক্ষরতা, বাড়ছে চেতনা।

আশার আলো : আশার কথা 'ক্রাই' (চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড ইউ)-সহ বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দেশের শিশুশ্রম ও শিশু নিপীড়নের বিরুদ্ধে গত প্রচার করে চলেছে। এরা কেউ শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করছে, রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা (ইমিউনাইজড্) করছে। ক্রাই একটি টোল ফ্রি ফোন নাম্বারের (১০৯৮) ব্যবস্থা করেছে, যেখানে ফোন করলে শিশু নিপীড়ন প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় পুলিশ, জুভেনাইল বিচার ব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছে অভিযোগ দায়ের হয় এবং এর ফলাফলও যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক।

আমাদের দেশের শিশুজগৎ বিশাল, তেমনি বিশাল তার সমস্যাও। শুধুমাত্র বছরে একদিন শিশুদিবস পালন করে তার নিরসন হবার নয়। এর জন্যে একদিকে যেমন চাই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তৃণমূলস্তরে আর্থিক উন্নয়ন, তেমনই চাই শিশুদের প্রতি ভালবাসা ও মানবিকতা। শিশুর সারল্য, হাসি, কলকলানি পাষাণহৃদয় শয়তানকেও টলিয়ে দেয়। শিশুদের আবেগ-উচ্ছ্বাস আনে স্বর্গীয় অনুভূতি। ভাষা, জাতিধর্ম নির্বিশেষে যে কোনো শিশুই নিষ্পাপ, ঈশ্বরের প্রতিনিধি। কিন্তু দেশের অবস্থাগতিকে তাদের একটা বড় অংশ ঘরে-বাইরে অবহেলিত, নিগৃহীত। তাদের ক্ষুধা, ব্যধি, চোখের জল অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্তরালেই থেকে যায়। লক্ষ লক্ষ শিশুর বঞ্চনা, ক্রন্দন মিডিয়ার আলোতে আসে না। প্রতিদিন আমরা টিভির চটকদার বিজ্ঞাপনে হাস্যোজ্জ্বল শিশুর মুখ যেভাবে অহরহ দেখতে পাই, তা কোনো বহুজাতিক সংস্থার প্রোডাক্টের বিক্রি বাড়াবার কৌশল। শিশুদের নিয়ে বিজ্ঞাপন নাকি যায় ভাল। দর্শকদের মর্মে গেঁথে যায় সেই প্রোডাক্ট। শিশুরা তাদের হাতিয়ার ছাড়া কিছু নয়। দেশের সমস্ত শিশুর ফুলের মতো মুখে হাসি ফোটাতে চাই আর্থিক উন্নয়ন ছাড়াও আমাদের সকলের সচেতনতা ও সহমর্মিতা। শিশুদের একটু সোহাগ দিয়ে যদি মানবিক হই, তাদের সাহায্যে যদি হাত বাড়িয়ে দিই তবে আমাদের এই বিশাল শিশুসম্পদ দেশের চেহারাটাই পুরো পাল্টে দিতে পারে, কারণ সেই প্রাচীন আপ্তবাক্য তো আমরা জানি— শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক।

উমা

প্রতিবেদন

আলোচনায় আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ

গত ১২ মার্চ ২০১৫, বালুরঘাট কলেজের 'উইমেন ডেভেলপমেন্ট সেল', আই কিউ এ সি-র (Internal Quality Assurance Cell) উদ্যোগে বালুরঘাট পুরসভার 'সুবর্ণতট' সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হল একদিনের রাজ্যস্তরীয় কর্মশালাভিত্তিক আলোচনা সভা। পাশাপাশি ছিল স্থানীয় স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি হস্তশিল্প প্রদর্শনী। উদ্বোধন করেন জেলাশাসক তাপস চৌধুরি। উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের স্বাগত জানান বালুরঘাট কলেজের পড়ুয়ারা। সেন্টার ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ-এর উদ্যোগে এবং অধ্যাপক পার্থ দত্তের সম্পাদনায় 'উইমেন স্টাডিজ: ইন্ডিয়ান পার্সপেক্টিভস' নামক বইটির উদ্বোধন হয়। উন্মোচন করেন কলকাতার সিটি কলেজের অধ্যাপিকা শাশ্বতী ঘোষ এবং বালুরঘাট পুরসভার অধ্যক্ষ চয়নিকা লাহা। অনুষ্ঠানের অন্যতম বক্তা বালুরঘাট বি এড কলেজের অধ্যক্ষ ববি মহন্ত তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে, বর্তমান সমাজে নারীর ভূমিকা সুদূরপ্রসারী এবং বৃহত্তর সমাজ গঠনে তা ইতিবাচক ভূমিকা নিচ্ছে। কর্মরতা মহিলাদের পারিবারিক জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে সমানভাবে দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ ধরনের কর্মশালার আয়োজন আগামীদিনে নারীদের সচেতন করে নিজস্ব ক্ষমতায়নের পথে চালিত হতে সাহায্য করবে, এই আশা ব্যক্ত করেন তিনি। আলোচনাসভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন উদ্যোক্তাদের পক্ষে অধ্যাপিকা বন্দনা ঘোষ। তিনি বলেন, পশ্চিমী দেশে, বিশেষত ইউরোপে নারী শ্রমিকদের দাবি আদায়ের পথ ধরে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি হলেও ভারতীয় সংবিধানে প্রথম থেকেই নারী পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু আমাদের স্তরবিন্যস্ত সমাজে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন ঘটে নি। সমানাধিকারও প্রতিষ্ঠা পায় নি। তাই মেয়েদেরই এ বিষয়ে অবহিত হতে হবে এবং সাংবিধানিক স্বীকৃতিকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে মুখ্য বক্তা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অধ্যাপিকা শাশ্বতী ঘোষ আন্তর্জাতিক নারীদিবস প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি তুলে ধরেন। 'স্লাইড শো'-র মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের কাছে ঐতিহাসিক অবস্থানটি ব্যাখ্যা করে নারীর অধিকার নিজেকেই কীভাবে অর্জন করে নিতে হবে— তা প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, অতীতে যেমন, আজও তেমনি নারীকে নানাভাবে দমন পীড়ন করে পিছিয়ে রাখার প্রবণতা সমস্ত সমাজে বর্তমান থাকলেও মেয়েরা সেই দমন-পীড়ন উপেক্ষা করে সবদিকে এগিয়ে চলেছে।

বিশিষ্ট সমাজকর্মী দেবযানী দাশগুপ্ত নারীর ক্ষমতায়নের পথে দারিদ্র্য দূরীকরণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাখা কমিটির সদস্য অধ্যাপক তৃপ্তি বে এ প্রসঙ্গে নারীশিক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশাখা কমিটির আর এক সদস্যা অধ্যাপিকা শুনিমা ঘোষ সাহিত্যে নারীর সশক্তিকরণের প্রসঙ্গের প্রকাশ এবং তার প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের অধ্যাপক নন্দিনী মুখোপাধ্যায় নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতাপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ নিয়ে এসে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার পথটিকে চিহ্নিত করেছেন। কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মাহমুদা বেগম সম্মান গ্রহণ করে বলেন যে, যদিও বর্তমানে মেয়েরা জনপ্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে আগের তুলনায় বেশি করে আসছে, তবুও তাদের উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন আছে। যথাযথ শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ না থাকায় জনপ্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে বহু জায়গাতেই তারা কার্যকরী ভূমিকা নিতে অসমর্থ হচ্ছে। বালুরঘাট পুর অধ্যক্ষা চয়নিকা লাহা সমাজে নারীশক্তি বিকাশের ওপর জোর দেন তাঁর বক্তব্যে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের শিক্ষা-কর্মাধ্যক্ষা সুনন্দা বিশ্বাস কবিগুরুর উদ্ধৃতি স্মরণ করে বলেন যে, নারীকে আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার নিজেকেই করে নিতে হবে। শারীরশিক্ষা বিভাগের শিক্ষিকা ও সাঁতার প্রশিক্ষক উজ্জ্বলা মণ্ডল মেয়েদের শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর জোর দেন এবং শারীর শিক্ষণে প্রশিক্ষিত হওয়ার জন্য মেয়েদের অনুরোধ জানান। জেলাশাসক তাপস চৌধুরি তাঁর বক্তব্যে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের

অংশগ্রহণকে স্বাগত জানান এবং তাদের কার্যপদ্ধতির প্রশংসা করে ভবিষ্যতে তাদের ওপর আস্থা বাড়ানোর কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বালুরঘাট তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত উপস্থিত মহিলাদের, বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকাদের, জেলা হাসপাতালের একজন মেডিক্যাল অফিসারকে, ক্রীড়াক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের, বালুরঘাট পৌরসভার মহিলা কাউন্সিলারদের, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কয়েকজন মহিলা প্রতিনিধিদের সম্মাননা জ্ঞাপন করেন 'উইমেন ডেভেলপমেন্ট সেল'-এর সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সর্বস্তরের মানুষের উপস্থিতি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো।

অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে সেলের পক্ষে অধ্যাপক বিউটি দাস সকলকে ধন্যবাদ জানান। পশ্চিমবঙ্গের এক প্রান্তিক অঞ্চলে এ ধরনের একটি সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করে উদ্যোক্তারা অবশ্যই 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' পালনের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোজনা করেছেন।

প্রতিবেদক:
অদিতি দাশগুপ্ত

বিপন্ন কুলিয়া ও মথুরা বিল

কল্যাণী গান্ধী হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় কুলিয়া ও মথুরা নামে দুটি পাশাপাশি বিল আছে। ঐতিহ্যমণ্ডিত এই বিলগুলির পরিবেশ বর্তমানে দূষিত হচ্ছে। বর্তমানে হাসপাতালের, কলকারখানার এবং নবনির্মিত প্রতিষ্ঠানগুলোর যাবতীয় বর্জ্য পদার্থের আস্তাকুঁড়ে পরিণত হয়েছে। অথচ এই বিলগুলো বহু যুগ ধরে নানা পাখিদের বিচরণ স্থল। বহু দেশ বিদেশের পাখি প্রাণের টানে এই বিলে আসে। জলজ উদ্ভিদগুলো তাদের অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্য। অথচ অবাধে চলছে এই পাখিগুলোর নিধনযজ্ঞ। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কিছু মানুষের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা ও অমানবিক আচরণে দিন দিন পাখির সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। ব্যবসায়ী প্রয়োজনে বিশেষত মাছ চাষ করার জন্য জাল দিয়ে পাখিদের ধরে রাখছে। মেরে মাংস খাচ্ছে। কিংবা পাশবিক আনন্দ পাওয়ার জন্য বোমা ফাটিয়ে ওদেরকে সন্ত্রস্ত করছে। তাছাড়া জল দূষণের ফলে জলজ উদ্ভিদগুলো সেভাবে বেড়ে উঠতে না পারায় পাখিরা খাদ্যাভাবে অন্যত্র গমন করছে কিংবা মারা যাচ্ছে। এভাবে পাখির সংখ্যা কমে গেলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হবে। পাশাপাশি জলাশয়গুলি নষ্ট হয়ে গেলে পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়বে। মুক্ত বায়ু পাওয়া যাবে না। মানুষের রোগব্যাধি বাড়বে। এই আশপাশের মানুষকে সচেতন করতে কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার এক সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করে। স্থানীয় মানুষ, স্কুলের ছেলেমেয়েরা, বিভিন্ন গণসংগঠনের সদস্যরাও অংশ নেন। কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের বিরোধিতা সত্ত্বেও সফলভাবে শেষ হয় র‍্যালি।

আঁধারে আলো

অরুণ পাল

It takes much time to kill a tree,
Not a simple jab of the knife
Will do it ...
So hack and chop
But this alone won't do it.
The bleeding bark will heal
And from close to the ground
Will rise curled green twigs,
Miniature boughs
Which if unchecked will expand again
To former size. (GIEVE PATEL)

On Killing a free নামে একটি ইংরাজি কবিতা থেকে নেওয়া উপরের উদ্ধৃত অংশটির মোদ্দা কথা হল, গাছকে মেরে ফেলা সহজ নয়, বেশ সময় লাগে। শুধু পুঁচিয়ে-কুপিয়ে একে মেরে ফেলা যায় না। ক্ষত সামলে উঠে গোড়া থেকে আবার নতুন পাতা গজায় এবং আগের মতোই বিরাট আকার ধারণ করে। যাঁরা হাওড়া মেইন ও কর্ড লাইন দিয়ে যাতায়াত করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে প্রত্যেকটা স্টেশনে বিরাট বিরাট গাছগুলিকে কেটে ফেলা হয়েছে। কেটে ফেলা গুঁড়ি থেকে গজানো কচি কচি পাতাগুলিকে দেখে মনে হচ্ছিল শিশুর ছোট্ট হাত বাড়িয়ে আকাশ ধরার আকুতি। রেল কর্তৃপক্ষের হঠাৎ খেয়াল হয়েছে প্রত্যেকটা স্টেশনকে আদর্শ স্টেশন বানাতে হবে এবং তার জন্য প্ল্যাটফর্মের বড় বড় গাছগুলিকে কেটে প্ল্যাটফর্মের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত শেড দিতে হবে। এতে নিশ্চয়ই ঠিকাদার থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট অনেকেরই পকেটে দুটো পয়সা ঢুকবে। আমরা নিত্যযাত্রীরা রেল কর্তৃপক্ষের এই বৃক্ষনিধন অভিযান বিনা প্রতিবাদে দেখে গেছি, যেভাবে জলাশয় ভরাট হতে দেখি। কী দরকার ঝামেলায় জড়ানো! ঘরের খেয়ে কে যায় বনের মোষ তাড়াতে! কিন্তু কারও কারও যে মোষ না তাড়ালে ঘুম হয় না। এরকমই কয়েকজন হল নালিকুলের মিঠুন, ইমন, রাহুল। ওরা কয়েকজন যুবক গড়ে তুলল, 'সেভ দ্য গ্রিন'। রেল কর্তৃপক্ষের এই বৃক্ষনিধন অভিযানের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রচার অভিযান শুরু করল স্টেশনে স্টেশনে। শুধু মাইক প্রচার নয়, মানুষকে সচেতন করার জন্য প্ল্যাটফর্মের ওপরই স্লাইড শো দেখানোর ব্যবস্থা করল। সংগ্রহ করা হল রেলযাত্রীদের স্বাক্ষর। সেই স্বাক্ষরসহ প্রতিবাদপত্র নিয়ে দেখা করা হল হাওড়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের সাথে। কিন্তু কিছুই হল না। গাছ কাটা চলতেই থাকল। তখন এগিয়ে এলেন জনাইয়ের শঙ্কর হাজরা এবং যাদবপুরের শান্তনু চক্রবর্তী। তাঁরা দুজনে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের কলকাতার ইস্টার্ন জোন বেঞ্চে ইস্টার্ন রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করলেন। তাঁরা বালি স্টেশনের অর্ধেক কেটে ফেলা গাছগুলির ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে আবেদনের সাথে পেশ করেছিলেন। গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ মহামান্য বিচারক ডঃ পি জ্যোতিমণি এবং ডঃ পি সি মিশ্র গাছ কাটার বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ জারি করলেন। তাঁদের আদেশে তাঁরা পরিষ্কারভাবে জানালেন, 'Thus, Respondent no.1 General Manager, Eastern Railway shall not proceed further to cut any tree for construction of passengers shelter at Bally further order of tribunal. তাঁরা আরও লিখলেন, We also make it clear that in respect of other places no trees shall be cut by the respondent no.1 for construction of passengers shelter without the permission of the tribunal.মামলা চলছে। স্টেশনগুলিতে গাছ কাটার চেষ্টা হলেই সঙ্গে সঙ্গে ছবি তুলে ট্রাইবুনালে জমা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। নজরদারি রাখছে সেভ দ্য গ্রিন ও এপিডিআর বালি শাখার কর্মীরা। রেলওয়ে যাত্রীদের কাছে স্টেশনে স্টেশনে ছোট ছোট পোস্টার সেঁটে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'আমি দেখি' কবিতাটির প্রথম স্তবক উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনটি শেষ করছি।

গাছগুলো তুলে আনো,/ আমার দরকার শুধু গাছ দেখা/
গাছ দেখে যাওয়া/ গাছের সবুজটুকু শরীরে দরকার/
আরোগ্যের জন্যে ঐ সবুজের ভীষণ দরকার।

উৎস মানুষ WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80 Rs. 20.00
৩৫ বর্ষ এপ্রিল-জুন ২০১৫ ২০টাকা

উৎস মানুষ পত্রিকার গ্রাহক হবার নিয়ম

বছরে ৪টি বেরোয়, ৩ মাস অন্তর। চাঁদা বছরে ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ইউ বি আই-এর যে কোনো শাখায় টাকা জমা দিন অথবা অন্য যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা জমা দিন ইউ বি আই কলেজ স্ট্রিট শাখায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নীচে দেওয়া হল—

United Bank of India
College Street Branch, Kolkata- 700073
UTSA MANUSH
SB ACCOUNT NO. 0083010748838
IFSC NO. UTBI0COLI08

ফোন করে কিংবা ই-মেল করে আপনার ঠিকানা (পিনকোড ও ফোন নং সহ) এবং কোন মাস থেকে গ্রাহক হলেন অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। বইমেলার স্টলে গ্রাহক করা হয়। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা হয়। ডাকে পত্রিকা পাঠানো হবে।

উৎস মানুষ পত্রিকা ও বই পেতে যোগাযোগ করুন

দীপক কুন্ডু
২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২
(কলেজ স্ট্রিট কর্পোরেশন অফিসের পাশের গলি)
ফোন নং- ৯৮৩০২ ৩৩৯৫৫

পুস্তক তালিকা

বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ	৪২.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	৩০.০০
তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক রণতোষ চক্রবর্তী	১৮.০০
বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০
এটা কী ওটা কেন (সংকলন)	৫০.০০
যে গল্পের শেষ নেই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৫০.০০
আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান (সংকলন)	৫০.০০
আরজ আলী মাতুব্বর ভবানীপ্রসাদ সাহু	২০.০০
প্রতিরোধ: অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (৩য়)	৬০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/ সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক নিরঞ্জন ধর	১০০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি (সংকলন)	৬০.০০
প্রমিথিউসের পথে (সংকলন)	৩৫.০০
লেখালিখি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি (সংকলন)	৪০.০০
মূল্যবোধ (সংকলন)	৫০.০০

প্রাপ্তিস্থান: দীপক কুন্ডু ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা- ১২, বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুকমার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), ধ্যানবিন্দু (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প ১৮বি, গড়িয়াহাট রোজ (সাউথ), কলকাতা-৩১, জ্ঞানের আলো (যাদবপুর কফি হাউসের উল্টোদিকে), থীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোজ, কলকাতা-২৬, ডঃ গৌতম মিস্ত্রি, ইন্সট্যান্ট ডায়গনস্টিক সার্ভিসেস, মন্ত্রিবাড়ি রোড। পো.অ. - চৌমাথা। আগরতলা-৭৯৯০০১। (০৩৮১)২৩০৮২৪৪/২৩১২৯৩৭। ডাঃ শান্তিরঞ্জন মল্লিকের চেম্বার– কোন্নগর।

উৎস মানুষ সোসাইটির পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক: সমীরকুমার ঘোষ